এক ঝলক
কিংবদন্তী হুমায়ূন আহমেদ

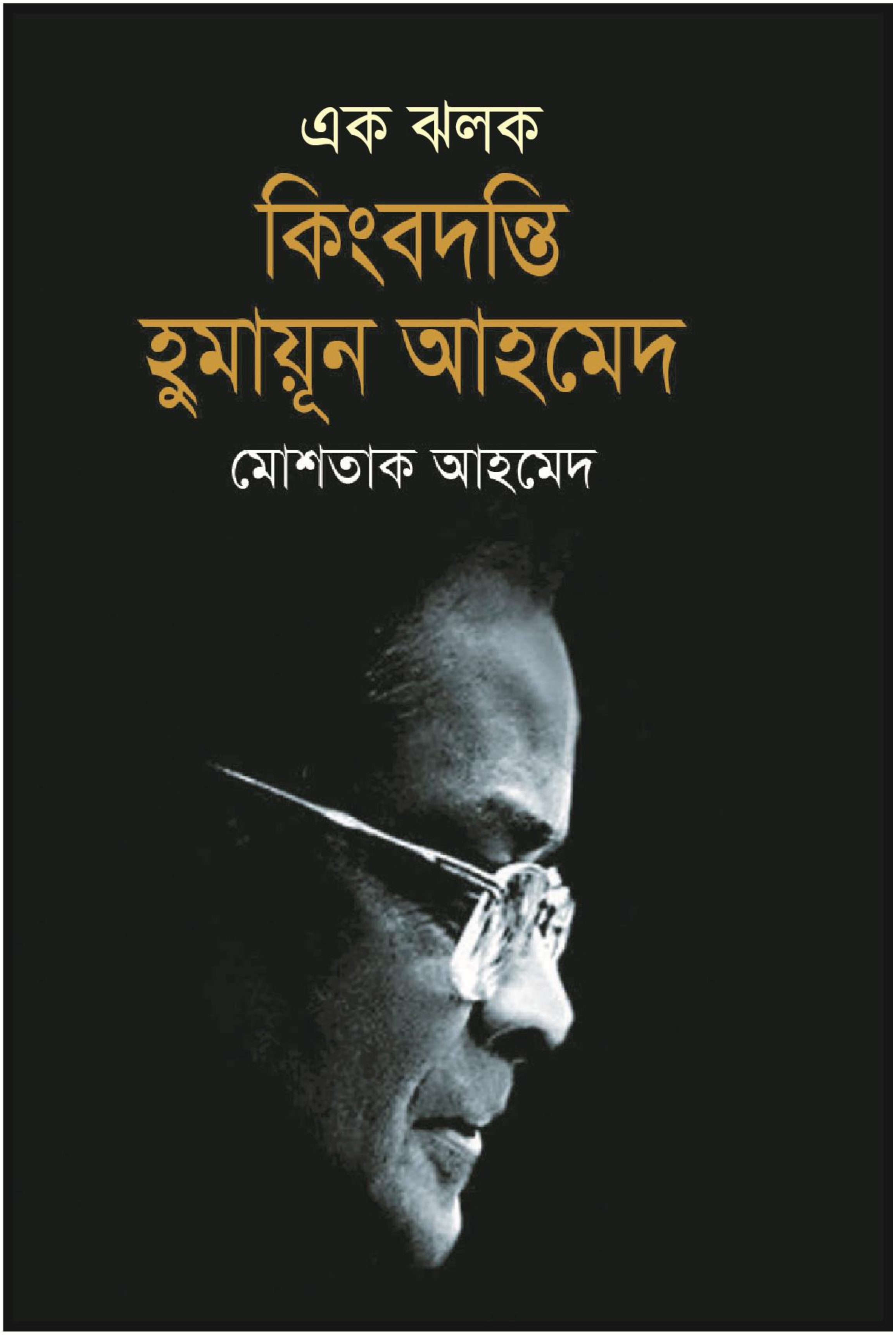

বিঃদ্রঃ

বইটি আমি লিখেছি আট বছর আগে। মূল বইয়ের ড্রাফট কপি এটি। কিছু ভূল ভ্রান্তি থাকতে পারে। আবার কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ বা স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাহিনী রয়েছে যেগুলো ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বের। সেক্ষেত্রে সময়ের কিছুটা হেরফের হতে পারে। ড্রাফট কপি হওয়ায় মূল বইয়ের সাথে কিছু পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। আর বানান নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কারণ বানানের অনেক নিয়ম এখন পালটে গেছে। এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সম্মানিত পাঠকদের কাছে।উল্লেখ্য বইটি আমি লিখেছিলাম মাত্র এক সপ্তাহে।

প্রথম ফ্লাপ

আমি হুমায়ূন আহমেদের বিশেষ করে তার লেখার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। কেন আমি তার ভক্ত তা আমি কখনো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে আমাকে যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি টানে সেটা হলো তাঁর লেখার রহস্য। তাঁর লেখার মধ্যে রহস্যের ডাইমেনশন এত বেশি যে আমি মাঝে মাঝে দিক হারিয়ে ফেলি। আর সেই দিক খুঁজতে গিয়ে নিজের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটাই যা সত্যি আমাকে বিস্মিত করে। হুমায়ূন আহমেদের অন্যকে এভাবে বিস্মিত করার ক্ষমতা অসাধারণ। এজন্য হুমায়ূন আহমেদ আমার কাছে সবসময় একজন রহস্যময় মানুষ। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ করার আশা নিরাশার প্রচেষ্টাগুলোও ছিল আরো রহস্যময়। সেগুলো এখন আমার জীবনে মধুর মধুর স্মৃতি। হুমায়ূন আহমেদের কথা মনে হলে সেই স্মৃতির কথাগুলোও মনে পড়ে। মনে পড়ে জীবনের শেষ সময় তাঁর আর আমার মাঝের সাদা কাপড়ের শেষ প্রতিবন্ধকতার কথা। আমি তখন তাঁর কত কাছে! অথচ তারপরও তিঁনি যেন অনেক দূরে! ঐ মুহূর্তেও তাঁকে আমার খুব রহস্যময় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ঐ রহস্যের ধুম্রজাল ভেদ করে আমি তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারব, পূরণ করত পারব হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আমার মনের গভীরে লালায়িত সুপ্ত বাসনাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কি পেরেছিলাম? পারা না পারার সেই রহস্য নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধানিবেদনে আমার এই ’এক ঝলক কিংবদন্তী হুমায়ূন আহমেদ’ ।

উৎসর্গ

কিংবদন্তী কথাসাহিত্যিক
হুমায়ূন আহমেদকে।

১

১৯৮৯ সাল হবে হয়তো। দিন তারিখ মনে নেই। তবে সময়টা মনে আছে। বিকেল সাড়ে চারটা কি পাঁচটা হবে। আমি তখন খুলনা জিলা স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। রবিন স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়া শেষে নিজের বাই-সাইকেলে উঠেছি, গন্তব্য সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকা। ওখানেই আমাদের বাসা। দূরত্ব প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটার।

সাইকেলে তিন চারবার প্যাডেল ঘুরাতে পিছনে ডাক শুনতে পেলাম, এ্যাই মোশতাক, এ্যাই থাম্।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ক্লাসমেট রকিব আমাকে ডাকছে। রকিবও আমার সাথে রবিন স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ত। আমি সাইকেল থামাতে রকিব আমার পাশে এসে সাইকেল থামাল। তারপর বলল, চল্ এক জায়গায় যাই।

কোথায়?

রকিব জোর দিয়ে বলল, যাবি কিনা বল্?

আগে বল্ কোথায় যাবি? না বললে বুঝব কীভাবে?

হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে যাব।

আমি তখন হুমায়ূন আহমেদকে চিনতাম না। বললাম, হুমায়ূন আহমেদ কে?

রকিব আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, কি বলিস! তুই হুমায়ূন আহমেদকে চিনিস না?

আমি খুব সহজভাবে বললাম, না চিনি না।

তুই এত গল্পের বই পড়িস, আর হুমায়ূন আহমেদকে চিনিস না! আবার বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন করল রকিব।

আমি উত্তরে বললাম, আমি পড়ি সেবা প্রকাশনীর বই। সবচেয়ে বেশি পড়ি বিদেশি অনুবাদ আর তিন গোয়েন্দা কিশোর, মুসা, রবিনের গল্প। এজন্য জুলভার্ন, আলেকজান্ডার দ্যুমো, রকিব হাসান, শওকত ওসমানের নাম জানি। এনাদের পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদ নামে কেউ আছে কিনা বলতে পারব না।

আরে ব্যাটা, সেবা প্রকাশনীর মধ্যে তুই হুমায়ূন আহমেদের নাম পাবি কোথায়? হুমায়ূন আহমেদ নিজেই একটা প্রকাশনী। তিনি এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লেখক।

আমি জানি না তুই কার কথা বলছিস। হুমায়ূন..

রকিব আমাকে কথা শেষ করতে দিল না। তাড়াতাড়ি বলল, আমার সাথে চল্, দেখলে চিনবি।

অবাক হয়ে বললাম, যার নামই শুনিনি তাকে দেখলে চিনব কীভাবে? আমি যাব না, তুই যা।

রকিব খানিকটা মর্মাহত হয়ে বলল, আমি ভেবেছিলাম তুই যাবি।

না রে, খুব ক্ষুধা লেগেছে। সেই সকালে বেরিয়েছি। প্রথমে ইংরেজি প্রাইভেট পড়লাম। তারপর স্কুল শেষে অংক প্রাইভেট পড়লাম। দুপুরে তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। স্কুলের টিফিন খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায়, যাই রে।

রকিব পূনরায় আমাকে রাজি করানোর চেষ্টা করে বলল, যাওয়ার পথেই পড়বে। সার্কিট হাউস মাঠে হুমায়ূন আহমেদ আছেন।

আমি আগের মতোই বললাম, না আমি যাব না। যাই।

এই বলে আমি সাইকেল চালাতে শুরু করলাম। রকিবও ওর সাইকেল চালিয়ে আমার পাশে পাশে আসতে লাগল। আমাদের দুজনের বাসা একই দিকে। প্রায় তিন কিলোমিটার পর ওর রাস্তা অন্যদিকে চলে গেছে। এই পথটুকু আমরা প্রায়ই একসাথে যাই।

সার্কিট হাউস মাঠ খুব বেশি দূরে না। খুব বেশি হলে তিন-চার মিনিট সময় লাগবে। আমার পাশে সাইকেল চালাতে চালাতে রকিব এবার খুব আকুতি নিয়ে বলল, মোশতাক, চল্ দেখে আসি।

না রে, আমি যাব না।

যাব আর আসব।

তুই একা যা।

এত বড় মানুষ! আমি একা যাই কীভাবে?

অসুবিধা কোথায়?

আমি একটা অটোগ্রাফ নিব।

আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম, অটোগ্রাফ কি?

তুই তো দেখি কিছুই জানিস না। বড় বড় মানুষেরা বই খাতায় যে স্বাক্ষর দেন সেই স্বাক্ষরকে অটোগ্রাফ বলে।

অটোগ্রাফ দিয়ে তুই কি করবি?

এত বড় লেখক! তার অটোগ্রাফের মূল্য কত তুই জানিস?

না জানি না। আমার জানার দরকারও নেই। আমি যাব না।

এই কথা বলে আমি আবার দ্রুত সাইকেলের প্যাডেল ঘুরাতে শুরু করলাম।

রকিব হতাশ ভঙ্গিতে আমার পাশে সাইকেল চালাতে লাগল। এখন ও আর কোনো কথা বলছে না। সার্কিট হাউস মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মাঠের মধ্যে দশ বারোটা স্টল দেখে বললাম, ঐগুলো কিসের স্টল?

রকিব উৎসাহ নিয়ে বলল, বইয়ের স্টল। বই মেলা হচ্ছে। ঐ মেলাই তো হুমায়ূন আহমেদ এসছেন।

ও, তাই নাকি!

রকিব আবার বলল, চল্ যাই। তুই বইও কিনতে পারবি।

আমি রকিবের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। তারপর বললাম, আমি বই কিনব, তুই পাগল! আমি বই ভাড়ায় পড়ি। দুই টাকায় বই ভাড়া পাওয়া যায়। সেখানে বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ করার কোনো অর্থ হয়?

তুই না কিনলে না কিনবি। আমি ঠিক করেছি আমি হুমায়ূন আহমেদের একটা বই কিনব।

কিনলে আমাকে পড়তে দিস্। পড়ে দেখব তোর লেখক কেমন।

তাহলে আমার সাথে চল্। আমি বই কিনে আগে তোকেই পড়তে দেব।

না আমি যাব না। আমি বাসায় যাব।

কথা বলতে বলতে সার্কিট হাউস মাঠ পার হয়ে এলাম। রকিবের মনটা খুব খারাপ। সে খুব আশাহত হয়েছে। আরও খানিকটা এগোতে সে বলল, তুই 'এই সব দিন রাত্রি' নাটক দেখিছিস্?

হ্যাঁ দেখেছি।

রকিব উৎসাহের সাথে বলল, কেমন ছিল নাটকটা?

অসাধারণ। তবে শেষে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, 'টুনি মারা গেল'। মারা না গেলে ভালো হতো।

রকিব এবার দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে বলল, আরে সাদেক আলীর ঘুটার কথা মনে নেই। স্যালাইন বানাতে গিয়ে কি ঘুটাটাই না দিত!

থাকবে না কেন? আমি নিজেও স্যালাইন বানাতে গিয়ে ঐরকম ঘুটা দিয়েছি। সবাই মিলে ঘুটা ঘুটা খেলাও খেলেছি। আসলে সবার অভিনয় ছিল অসাধারণ..

ঐ নাটকের লেখক কে জানিস?

না জানি না।

হুমায়ূন আহমেদ।

আমি সাথে সাথে সাইকেলের ব্রেক কষলাম। আমাকে ব্রেক কষতে দেখে রকিবও ব্রেক কষল। তারপর অবাক হয়ে বলল, কি হলো?

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, হুমায়ূন আহমেদ 'এই সব দিন রাত্রি' নাটকের লেখক! তুই আমাকে আগে বলবি না?

বললে কি হতো?

কি হতো মানে! হুমায়ূন আহমেদ যদি 'এই সব দিন রাত্রি' নাটকের লেখক হয়ে থাকেন আমি অবশ্যই তাকে দেখতে যাব। আমি আগে থেকে কি ভেবে রেখেছি জানিস? তাঁর সাথে কথা হলে জিজ্ঞেস করব কেন তিঁনি টুনিকে মেরে ফেললেন?

রকিব অতি উৎসাহের সাথে বলল, তাই নাকি? তাহলে চল্ যাই। প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে আসি।

চল্, তাড়াতাড়ি চল্।

আমরা সাইকেল ঘুরালাম। তারপর এগিয়ে যেতে থাকলাম সার্কিট হাউস মাঠের দিকে। রকিব সাইকেল চালাতে চালাতে বলল, আমার এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে রে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, ভয়ের কি হলো?

লেখকরা কেমন যেন গম্ভীর হয়। দেখলে ভয় ভয় করে।

আগে কোনো লেখককে দেখেছিস নাকি?

না।

তাহলে বুঝলি কীভাবে?

জানি না।

চল্ যাই, যা হবার হবে।

রকিব জোরে সাইকেল টান দিল। আমিও সাইকেল টান দিয়ে ওর পাশে চলে এলাম। দুজনের লক্ষ্য সার্কিট হাউজ মাঠে দেশ বরেণ্য লেখক হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎ পাওয়া, তার অটোগ্রাফ নেয়া এবং তাকে জিজ্ঞেস করা এই সব দিন রাত্রি ধারাবাহিক নাটকে তিনি কেন টুনিকে মেরে ফেলেছেন। সার্কিট হাউস মাঠে সাইকেল রেখে আমরা দুজন ধীর পায়ে বইয়ের স্টলগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। হঠাৎ একটা প্রশ্ন মাথায় আসায় আমি রকিবকে জিজ্ঞেস করলাম, হুমায়ূন আহমেদ দেখতে কেমন?

রকিব বলল, ঠিক বুঝাতে পারব না। একবার আমি ছবিতে দেখেছি। সামনাসামনি দেখিনি।

দেখলে চিনবি?

রকিব ঠোঁট কাঁমড়াতে শুরু করল। বুঝলাম সে নিশ্চিত হতে পারছে না। বললাম, ছবি কোথায় দেখলি?

একটা বইতে, বইয়ের শেষে ছিল।

তাহলে আগে বইতে দেখি, তারপর তাঁকে খুঁজব।

ঠিক আছে।

আমরা প্রথম বইয়ের স্টলে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদের বই পেলাম। কিন্তু পিছনে অর্থাৎ শেষ ফ্ল্যাপে তার ছবি নেই। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম স্টলে গিয়ে একটা বইতে হুমায়ূন আহমেদের ছবি পেলাম। বইটির নাম কি ছিল এতদিন পর আমার মনে নেই। তবে ছবি দেখে আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। হুমায়ূন আহমেদকে ছোট-খাট একটা মানুষ মনে হচ্ছিল। ঐ মানুষটাই যে 'এই সব দিন রাত্রি' নাটকের লেখক তা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। যাইহোক, এরপর আমরা দুজন হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজতে শুরু করলাম।

কয়েকটা স্টল পার হতে বললাম, রকিব, বই কিনবি না?

এখন না। আগে হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজে পাই, তারপর কিনব। যদি নিয়ম এরকম হয় যে তার সামনে থেকে বই না কিনলে তিঁনি অটোগ্রাফ দেবেন না, তখন মুশকিল হয়ে যাবে।

তা তুই ঠিক বলেছিস।

আমরা একে একে সবগুলো স্টল ঘুরলাম। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের চেহারার কাউকে দেখতে পেলাম না। এক পর্যায়ে বললাম, রকিব, আমরা হুমায়ূন আহমেদকে চিনতে ভুল করিনি তো?

না, তা হবে কেন?

বলতে চাচ্ছিলাম তিনি হয়তো স্টলে বসে আছেন, কিন্তু এমন হলো আমরা তাঁকে দেখলাম না।

সেরকম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। স্টলগুলোতে ক্রেতার সংখ্যা একেবারে কম। সামনে দাঁড়ালে ভিতরে কে আছে স্পষ্ট দেখা যায়।

আমি বিড় বিড় করে বললাম, কী অদ্ভুত ব্যাপার? সব স্টলে হুমায়ূন আহমেদের বই আছে, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ নেই।

রকিব একটু চিন্তা করে বলল, আমরা না হয় আর একবার স্টলগুলো দেখি।

ঠিক আছে চল্ দেখি।

আবার আমরা সবগুলো স্টল ঘুরলাম, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে পেলাম না। রকিব শেষে থাকতে না পেরে স্টলের এক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, হুমায়ূন আহমেদ কোথায় এসেছেন?

বিক্রেতা অবাক হয়ে বলল, হুমায়ূন আহমেদে আসবেন কেন?

না মানে আজ তার এখানে আসার কথা।

কে বলেছে আপনাকে?

রকিব থতমত খেয়ে বলল, আমার পাড়ার এক বড় ভাই বলেছে।

বিক্রেতা দ্রুত বলল, হুমায়ূন আহমেদের আসার কথা ছিল কিনা জানি না। তবে তিনি আসেন নি।

কথাটা শোনার সাথে সাথে রকিবের মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতে আমি চোখের ইশারায় সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। হুমায়ূন আহমেদ এসেছেন কিনা সেটা নিশ্চিত হতে আরও দুটো স্টলে নিজে জিজ্ঞেস করলাম। তারা নিশ্চিত করল, হুমায়ূন আহমেদ আসেননি। রকিব তখন দূরে গাছের সাথে তালা দিয়ে রাখা সাইকেলের দিকে তাকিয়ে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল সাইকেলের দিকে। আমিও রকিবকে অনুসরণ করলাম।

খুলনার সার্কিট হাউস মাঠে হুমায়ূন আহমেদকে দেখার সেটাই ছিল আমার প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু সেদিন আমি সফল হতে পারিনি। আমার আর রকিবের ঐ দিন হুমায়ূন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, তার কোনো বইও কেনা হয়নি, তাঁর অটোগ্রাফও নেয়া হয়নি এবং তাঁকে জিজ্ঞেসও করা হয়নি কেন তিঁনি 'এই সব দিন রাত্রি' নাটকে টুনিকে মেরে ফেলেছিলেন। তবে ঐ দিনটি একেবারে বৃথা যায়নি। দিনটি আমার জীবনে অবশ্যই একটা স্মরণীয় দিন। কারণ ঐ দিন আমি হুমায়ূন আহমেদের নাম জানতে পেরেছিলাম এবং দেখে পেয়েছিলাম তার ছবিও।

২

হুমায়ূন আহমেদকে আমি দ্বিতীয়বার দেখার চেষ্টা করি ১৯৯২ সালের শেষের দিকে। আমি তখন এইচএসসি পরীক্ষা শেষে ঢাকায় কোচিং করতে এসেছি। উদ্দেশ্য ঢাকা ভার্সিটি, মেডিকেল কিংবা বুয়েটে ভর্তি হওয়া। পড়াশুনা নিয়ে খুব ব্যস্ত। একদিন ঢাকা ভার্সিটির কার্জন হলে এসেছিলাম ভর্তি পরীক্ষার ফরম কিনতে। যতদূর মনে পড়ে কার্জন হলের অগ্রণী ব্যাংক থেকে ফরম বিক্রি করা হতো। ব্যাংকে আসার পর জানতে পেরেছিলাম কি এক কারণে ফরম দিতে দেরি হবে। হাতে ঘণ্টাখানেক সময় ছিল। তখন হঠাৎ মনে হলো হুমায়ূন আহমেদকে দেখব। কিন্তু কীভাবে দেখব জানি না। শুধু জানতাম তিনি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। তখন আমি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট খুঁজতে শুরু করি। কার্জন হলের ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে লাল ইটের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে গিয়ে আমার হাত পা কাঁপতে শুরু করল। কারণ তখনও আমি ভার্সিটির ছাত্র না। বুকটা দুরু দুরু করছে। শেষে সাহস করে ঢুকে গেলাম ভিতরে। করিডোরে অনেক ছাত্র-ছাত্রী। সবাই নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। হুমায়ূন আহমেদের রুম কোথায় আমি জানি না। কাউকে যে জিজ্ঞেস করব সেই সাহসও পাচ্ছি না। আমি কীভাবে রুম খুঁজে পাব সেটাও জানতাম না। ধারণা ছিল রুমের দরজার সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে 'প্রফেসর হুমায়ূন আহমেদ'। এরকম ধারণা থেকে 'প্রফেসর হুমায়ূন আহমেদ' নেমপ্লেট লাগানো দরজা খুজতে শুরু করলাম। কিন্তু পেলাম না। হঠাৎ অনুভব করলাম আমি ঘামতে শুরু করেছি। কেন ঐরকম হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। তারপর মনে হলো, কি দরকার হুমায়ূন আহমেদকে দেখার? না দেখলে কি হয়? এরকম একটা চিন্তা থেকে আমি দ্রুত কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। চলে যাওয়ার সময় বাইরে বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। তখন আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আমি হঠাৎই হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে পাব। শেষ পর্যন্ত আর তার আর দেখা পাইনি। এভাবে হুমায়ূন আহমেদকে দেখার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও আমার ব্যর্থ হয়।

ঐ দিন কেন আমার হুমায়ূন আহমেদকে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি হুমায়ূন আহমেদের ঐ সময়কার ধারাবাহিক নাটকগুলো আমাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সব দিনরাত্রি, অয়োময়, বহুব্রীহি, আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেই, ঐ ধারাবাহিক নাটকগুলো সত্যি ভোলার মতো নয়। আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ নাটকগুলো মঙ্গলবার রাত নটার দিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারিত হতো। ঐ সময় মাত্র একটাই চ্যানেল ছিল। মঙ্গলবারের নাটকে কি ঘটবে বা কি ঘটবে না সেটা ছিল আমাদের সবার কাছে সারা সপ্তাহের আলোচনার বিষয়। এই আলোচনা নিয়ে নানারকম মজার মজার ঘটনাও ঘটেছে। বহুব্রীহি নাটকের একটা ঘটনা বলছি।

বহুব্রীহি নাটকে আসাদ্দুজ্জামান নূরের এক ছেলে আর এক মেয়ে ছিল। নাটকে একবার দেখান হয় এই ছোট ছেলে মেয়ে দুটো একের পর এক জিনিসপত্র কাটতে থাকে। ব্যাপারটা এরকম যে

তারা যা পায় তাই কাটে, এমন কি আসাদুজ্জামান নূরের জামা কাপড় পর্যন্ত কেটে ফেলে। যাইহোক নাটকের ঐ পর্ব শেষ হলে হঠাৎ রব উঠল পরবর্তী পর্বে আসাদুজ্জামান নূর ঘুমিয়ে থাকলে ঐ ছেলে মেয়ে দুটো আসাদুজ্জামান নূরের দাড়িও কেটে ফেলবে। এ কারণে পরবর্তী পর্বে আসাদুজ্জামান নূরকে দাড়ি ছাড়া দেখা যাবে। ব্যাপারটা চারদিকে ব্যাপক আলোচিত হতে লাগল। কেউ বিশ্বাস করল আবার কেউ করল না। যারা বিশ্বাস করল তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিল জুয়েল আর যারা বিশ্বাস করল না তাদের মধ্যে একজন ছিল রুমি। আমরা একসাথে বিকেলে বল খেলতাম। বিকেলে খেলার মাঠে হঠাৎ দুজন বাজি ধরে বসল। যদি আসাদুজ্জামান নূর দাড়ি কাটেন তাহলে রুমি মাথার চুল কামিয়ে ফেলবে আর যদি না কাটেন তাহলে জুয়েল মাথার চুল কামাবে। ঐ বাজিতে আমরাসহ আরও অনেকে সাক্ষী থাকলাম।

পরের মঙ্গলবার সকাল থেকেই আমাদের টেনশন শুরু হয়ে গেল। রাতে কি হয়? সত্যি কি আসাদুজ্জামান নূর দাড়ি কাটবেন? নাকি আগের মতোই থাকবেন? বিকেলে খেলার মাঠে জুয়েল আর রুমির সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম দুজনের মনোবল খুব শক্ত। জুয়েল নাকি কোন পত্রিকায় পড়ে জেনেছে আসাদুজ্জামান নূর দাড়ি কাটবেনই। আবার রুমিও নাকি ঢাকার তার কোন্ আত্মীয়ের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়েছে আসাদুজ্জামান নূর দাড়ি কাটবেন না। আমাদের ভয় ছিল দুজনের কেউ আবার বাজি থেকে নিজেকে সরিয়ে না নেয়। তা অবশ্য তারা করেনি।

রাতে দুরু দুরু বুকে নাটক দেখলাম। সম্পূর্ণ নাটকে মনোযোগ ছিল আসাদুজ্জামান নূরের প্রতি। সত্যি কি তিনি দাড়ি কাটবেন? শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি দাড়ি কাটেননি। তাই পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হলো জল্পনা কল্পনা, জুয়েল তার মাথা ন্যাড়া করবে। বিকেলে কাজটা করা হবে। কিন্তু আমরা অনেকে খুব শঙ্কিত ছিলাম এই ভেবে যে জুয়েল হয়তো আর মাঠে আসবে না। আমাদের অবাক করে দিয়ে জুয়েল ঠিকই বিকেলে মাঠে হাজির হলো। রুমি তাকে মাথা ন্যাড়ার কথা বললে সে বলল, আসাদুজ্জামন নূর এই পর্বে দাড়ি কাটেননি তাতে কি, পরবর্তী পর্বে কাটবেন।

রুমি গো ধরে বলল, বাজির শর্ত সেরকম ছিল না, শুধু এই পর্বেই কাটার বিষয়ে বাজি ছিল।

জুয়েলও কম বুদ্ধিমান না। সে বলল, আসাদুজ্জামান নূর ঠিকই দাড়ি কেটেছেন। কিন্তু পরিচালক এই পর্বে সেটা দেখান নি। পরবর্তীতে দেখাবেন। এখন পরিচালক যদি না দেখায় তাহলে আমি কি করতে পারি?

অনেকে জুয়েলকে সমর্থন করায় রুমি খানিকটা দ্বিধান্বিতভাবে বলল, ঠিক আছে। তাহলে ধারাবাহিক নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাজি চলবে।

জুয়েল সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল।

বহুব্রীহি নাটকে আসাদুজ্জামান নূর শেষ পর্যন্ত আর দাড়ি কাটেননি। জুয়েল অবশ্য তার মাথা ন্যাড়া করেছিল। তবে বাজিতে হেরে নয়, ফ্যাশনের অংশ হিসেবে। ঐ সময় হঠাৎ মাথা ন্যাড়া করার ফ্যাশন শুরু হয়। একের পর এক সবাই মাথা ন্যাড়া করতে থাকে। অবস্থা এমন হয় যে যখন আমরা ফুটবল খেলার জন্য দল ভাগ করতাম তখন দুটি দল হতো, একটি ছিল চুলওয়ালা মাথার দল আর অন্যটা ন্যাড়া মাথার দল। ভালো প্লেয়াররা সব ন্যাড়া মাথার দলে হওয়ায় ঐ দলটা প্রতিদিনই জিততে থাকে। তখন এই ভেবে খুব দোটানায় ভুগছিলাম, আমি ন্যাড়া হব কিনা? কয়েকদিন পর কয়েকজন ন্যাড়াকে সন্ধ্যার পর একসাথে ঘুরতে দেখে সোনাডাঙ্গা থানা পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে আমার ন্যাড়া হওয়ার শখ উবে যায়। সেই সাথে খুলনার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকা থেকে ন্যাড়া ফ্যাশন কালচারও উঠে যায়।

যাইহোক, বলছিলাম হুমায়ূন আহমেদের নাটকের জনপ্রিয়তা নিয়ে। তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তা এতটাই বেশি ছিল যে নাটকের পরবর্তী পর্বে কি ঘটবে সেটা নিয়ে ন্যাড়া হওয়া পর্যন্ত বাজি ধরা হয়েছিল। শুধু বাজি না, নাটক নিয়ে আলোচনা করতেও দারুন ভালো লাগত। ঐ সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় সিরিজ ছিল ম্যাকগাইভার। রাতে ম্যাকগাইভার দেখে পরের দিন স্কুলে শুরু হতো ম্যাকগাইভারের আলোচনার ঝড়!। সে কি প্রতিযোগিতা! কার আগে কে কতটুকু বলতে পারে। ঠিক একইভাবে আলোচনার ঝড় বইত হুমায়ূন আহমেদের ধারাবাহিক নাটকগুলো নিয়ে। গত পর্বে কি ঘটেছে এবং পরবর্তী পর্বে কি ঘটবে এটা নিয়ে আলোচনার মজাই ছিল অন্যরকম। আর আমাদের আলোচনার মূল জায়গা ছিল ফুটবল খেলার মাঠ। শুধু আলোচনা সমালোচনার জন্যই আমরা অনেকে এক ঘণ্টা আগে ফুটবল মাঠে আসতাম। মাঠের মধ্যে গোল হয়ে বসে কে কার আগে কত

কথা বলতে পরে শুরু হতো তার প্রতিযোগিতা। তবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যবান হতো সে যে ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার কারণে নাটক দেখতে পারত না। সেই বেচারাকে একেবারে কালো মুখ করে বসে থাকতে হতো। মনে হতো তার থেকে দুর্ভাগা আর কেউ নেই।

হুমায়ূন আহমেদের নাটকগুলো দেখার সময় মূলত নাটকের চরিত্রকে নিয়েই আলোচনা হতো বেশি, নাট্যকরকে নিয়ে নয়। এজন্য নাট্যকরের প্রতি অতটা আগ্রহ ছিল না। আসলে তখন বয়সের কারণে বুঝতে পারতাম না যে মূল কারিশমাটা নাট্যকরেরই। তিনি সুন্দরভাবে নাটক লেখেন বলেই পরিচালক সুন্দরভাবে নাটকটা তৈরি করতে পারেন এবং অভিনেতারা চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সম্ভবত ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন সময়ে ধীরে ধীরে নাট্যকরের গুরুত্বটা আমি বুঝতে পারি এবং হুমায়ূন আহমেদ নামটা মনের মধ্যে গেঁথে যায়। এ কারণে ভার্সিটিতে ভর্তির প্রাক্কালে হঠাৎই হুমায়ূন আহমেদকে দেখার শখ হয়েছিল এবং কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সেদিন তাকে আমি দেখতে পাইনি।

হুমায়ূন আহমেদের নাটক এবং উপন্যাস নিয়ে জীবনে অনেক মধুর স্মৃতি আছে। এই স্মৃতিগুলোর অধিকাংশ ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার অর্থাৎ ১৯৯২ সালের পূর্বের। ঐ সময়গুলো সঠিকভাবে উল্লেখ করা সত্যি দুরহ ব্যাপার। তবে নাটকের সাথে সাথে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো মনে পড়ে।

আর একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। বুহুব্রীহি নাটকে মামা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আলী যাকের। একবার তাকে তার এক অফিস সহকর্মী একটি যাদু দেখিয়ে বিস্মিত করে। যাদুটি এমন ছিল যে, 'ফুলানো বেলুনের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা উল বোনার (সোয়েটার তৈরির জন্য আগে মেয়ারা ব্যবহার করত) ধাতব কাটা ঢুকিয়ে দেয়ার পরও বেলুনটা ফাটছে না'। আলী যাকের ছিলেন অসম্ভব মেধাবী এবং তিনি যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তখন নাটকে দেখা যায় যে তিনি শত শত বেলুন কিনেছেন এবং কেন ফেলুন ফাটেনি সেই রহস্য উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তাকে সহায়তা করছে বাড়ির কাজের ছেলে এবং তার একনিষ্ঠ ভক্ত কাদের। ঐ নাটক দেখার পর আমাদেরও তখন আলী যাকেরের মতো অবস্থা হয়েছিল। পরেরদিন এটা ছিল আলোচনার মূল বিষয়। একেকজন একেক কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, বেলুনের বিশেষ কোনো জায়গা দিয়ে কাটা ঢুকিয়ে দিলে বেলুন ফাটবে না; কেউ বলল বেলুন পানিতে ভিজিয়ে তার মধ্যে দিয়ে কাটা ঢুকালে বেলুন ফাটবে না; কেউ বলল বেলুনে টেপ লাগিয়ে কাটা ঢুকালে সেটি ফাটবে না; আবার কেউ বলল বেলুন সরিষার তেলে চুবিয়ে কাটা ঢুকালে বেলুন ফাটবে না। বেলুন না ফাটার ঐ রহস্য উম্মোচনে সবাই এতটাই আমরা উদ্গ্রীব ছিলাম যে পরের দিন আর ফুটবল খেলা হয়নি। বেলুন কিনে সবাই মাঠের মধ্যে বসে নানাভাবে বেলুন না ফাটার রহস্য উম্মোচন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বেলুনের যত জায়গায় কাটা ঢুকানো যায় ঢুকানো হলো, কিন্তু কোনো কাজ হলো না, প্রত্যেকবারই বেলুন ফেটে গেল। ফুলানো বেলুনকে নানাভাবে পানিতে চুবিয়ে তারপর কাটা ঢুকিয়েও কোনো লাভ হলো না। এরপর বেলুনের এখানে ওখানে টেপ লাগানো হলো, তাতেও ব্যর্থ হলাম আমরা। অবশেষে বেলুন সরিষার তেলে ডুবানো হলো, তারপরও আমরা ব্যর্থ। আমাদের ফুটবল দলে কালিপদ নামের একজন হিন্দু ছেলে ছিল যে কিনা টুকটাক ম্যাজিক জানত। তার সরানপন্ন হতে সে বেলুনে ফু টু দিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কেরামতিও ফেল মারল। এতে বেচারার মুখ একেবারে লাল হয়ে গেল। তবে সে হাল ছাড়ল না। প্রতিজ্ঞা করে বলল, একদিনের মধ্যে সে ঐ রহস্য উম্মোচন করবেই করবে। কিন্তু পরের দিন কালিপদ আর সেই রহস্য উম্মোচন করতে পারল না। এর মধ্যে নাটকের পরবর্তী কোনো এক পর্বে দেখানো হলো মামা আলী যাকের বেলুন না ফাটার রহস্য উম্মোচন করতে সফল হয়েছেন। সেটা দেখে আমাদের আবার নতুন প্রচেষ্টা শুরু হলো। মামা পারলে আমরা পারব না কেন? কিন্তু আগের মতোই ব্যর্থ হলাম আমরা। তবে কালিপদ কীভাবে যেন পেরে গেল। আর যায় কোথায়? সবাই তখন ছুটলাম কালিপদের পিছনে। কালিপদ শেষে জানাল, বেলুনটাকে এক ঘণ্টা মুখের মধ্যে রেখে থুথুতে ভিজিয়ে তারপর যদি তাতে শলাকা বা কাটা প্রবেশ করান হয় তাহলে বেলুনটা ফাটবে না। শর্ত, ঐ এক ঘণ্টা হা করা যাবে না। ঐ দিনই বেলুন কিনে এক ঘণ্টা মুখের মধ্যে রাখলাম। ঐ এক ঘণ্টা আমার জীবনে ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ এক ঘণ্টা। আমরা সাথে আমার আরও দুই বন্ধু ছিল (এত দিন পর নাম মনে নেই)। তিনজন আমাদের বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কারো সাথে কোনো কথা বলার উপায় নেই। প্রত্যেকের মুখে একটা করে বেলুন। মনে হচ্ছিল মুখের চাপা বুঝি ভেঙ্গে আসবে, মাংসপেশি

সব অবশ হয়ে যাবে। অবশেষে এক ঘণ্টার সমাপ্তি ঘটে। তখন সে কি আনন্দ! মনে হচ্ছিল বেলুনটা বুঝি সাত রাজার ধন। কিন্তু তারপর যা ঘটল তা সত্যি আশাতীত ছিল। বেলুনটা ফুলিয়ে তাতে শলাকা ঢুকাতে 'ঠাস' শব্দ করে ফেটে গেল। একই অবস্থা হয়েছিল আমার অন্য দুই বন্ধুর বেলুনেরও। তখন বুঝতে পেরেছিলাম কালিপদ আমাদের বোকা বানিয়েছে। ঐ ঘটনার পর মনের দুঃখে অনেকদিন কালিপদের সাথে কথা বলিনি। পরে পত্রিকা থেকে কিংবা বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম বেলুনে যেখান দিয়ে শলাকা ঢুকাতে হবে সেখানে গ্রীজ মেখে বিশেষ উপায়ে কাটাটা ভিতরে ঢুকালে নাকি বেলুন ফাটবে না। জানি না ঐ তথ্য সত্য কিনা। কারণ আমি নিজে কখনও সেটা পরীক্ষা করে দেখিনি।

৩

হুমায়ূন আহমেদকে আমি তৃতীয়বার দেখার চেষ্টা করি যখন আমি ফার্মেসির ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র। সময়টা ১৯৯৩ সাল। আমাদের ক্লাস তখন কার্জন হলের লাল বিল্ডিং এ হতো। বিল্ডিংটা ছিল একেবারে পূর্ব দিকে। ফার্মেসি বিল্ডিং আর কেমেষ্ট্রি বিল্ডিং এর মধ্যে দূরত্ব ছিল মাত্র পঞ্চাশ গজের মতো। অবাক হলেও সত্য আগের বছর ফর্ম কেনার সময় হুমায়ূন আহমেদকে দেখার ইচ্ছে হলেও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর একবারও হয়নি। হয়তো তাঁকে দেখার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তবে ঐ সময় তাঁর লেখার সাথে আমার পরিচয় হতে থাকে। তখন আমি সালিমুল্লাহ বা এস এম হলে থাকতাম। হলের ছাত্রদের কাছে তাঁর যে বই পাওয়া যেত সেগুলো এনে পড়তাম। একসময় অনুভব করতে থাকি ধীরে আমি তাঁর একজন একনিষ্ঠ পাঠকে পরিণত হতে শুরু করেছি।

হুমায়ূন আহমেদকে তৃতীয়বার দেখার চেষ্টা করার মূল কারণ ছিল আমার বন্ধু রাজা। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে রাজা একজন। একসাথে খুলনা বিএল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি। আমি ভর্তি হই ঢাকা ভার্সিটির ফার্মেসিসে আর রাজা ভর্তি হয় খুলনা ভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সে। বর্তমানে সে একটা প্রাইভেট ব্যাংকের সিনিয়র এভিপি হিসেবে কর্মরত আছে। রাজা কি এক কারণে ঐ সময় আমার কাছে এসেছিল। কোনো এক কথা প্রসঙ্গে দুজনের মাথায় হঠাৎ হুমায়ূন আহমেদকে দেখার ঝোক উঠে। শেষে ঠিক করলামা ঐ দিন হুমায়ূন আহমেদকে দেখবই। এই সিদ্ধান্তে আসার পর রাজা জিজ্ঞেস করল, হুমায়ূন আহমেদ স্যার কোথায় বসেন?

হুমায়ূন আহমেদ তখন মোকাররম ভবনের দোতলায় বসতেন। বিষয়টা আমার জানা ছিল। কেমিষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট সেখানে স্থানন্তর হচ্ছিল। ফার্মেসী বিভাগও ঐ বিভাগের এক তলায় শিফট্ হচ্ছিল। আমাদের দাপ্তরিক কাজগুলো তখন মোকাররম ভবনে হতো। এজন্য ঐ ভবনের সবকিছু আমার পরিচিত ছিল। অবশ্য কখনও দোতলায় কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে যাইনি।

রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, আমাদের মোকাররম ভবনের দোতলায় যেতে হবে।

যাবে নাকি তুমি?

হ্যাঁ যাব।

মোকাররম ভবনে আমারও কি যেন একটা ছোট কাজ ছিল। এজন্য সেখানে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই দুজনে কার্জন হল থেকে হেঁটে হেঁটে মোকাররম ভবনে গেলাম। পথটা অনেক লম্বা, প্রায় পাঁচ ছয়শ গজ হবে। এই লম্বা পথ হেঁটে এলেও আমরা হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি, তাঁর সাথে যে আমাদের দেখা করব সেটা নিয়ে কোনো টেনশনও ছিল না। মোকাররম ভবনে আমার কাজ শেষ হওয়ার পর শুরু হলো টেনশন। এখন আমাদের দোতলায় উঠতে হবে, হুমায়ূন আহমেদের রুম খুঁজে বের করতে হবে এবং তার সাথে দেখা করতে হবে। রাজা বলল, হুমায়ূন আহমেদ স্যার কোন জায়গায় বসেন তুমি জানো?

না জানি না। দোতলায় গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

আমরা আসলে কি করব? আমাদের প্ল্যান কি?

প্ল্যান মানে?

মনে করো দেখা হলো। সামনাসামনি পড়ে গেলাম, তখন কি করব, কি বলব?

প্রথমে সালাম দেব।

কে দেবে? তুমি না আমি?

আমিই দেব।

ঠিক আছে। তারপর?

তারপর তুমি বলবে, 'স্যার আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, আমি আপনার একজন ভক্ত'।

রাজা ঢোক গিলে বলল, আমি কীভাবে বলব? আমি তোমাদের ভার্সিটির ছাত্র না। তাছাড়া আমি তার খুব শক্ত ভক্তও না। তুমিই বলবে।

ঐ সময় ভার্সিটির টিচারদের সত্যি ভয় পেতাম। তাই আমি আমতা আমতা করে বললাম, আ..আমি বলব?

হ্যাঁ তুমি বলবে।

সেটা কি ঠিক হবে?

হবে।

যদি রাগ করেন? আমার ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ করেন?

অভিযোগ করবেন কেন? আমার কি কোনো অন্যায় কাজ করছি?

কেন যেন মন থেকে সায় পাচ্ছিলাম না। খানিকটা এগিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, হুমায়ূন আহমেদে স্যারকে তোমার কেমন মনে হয় রাজা?

কেমন মানে?

হাসিখুশি নাকি গম্ভীর?

কিছুটা গম্ভীর।

কথাটা শোনার পর আমি আরও খানিকটা দমে গেলাম। মনে হলো দেখা করার পরিকল্পনা বাদ দেই। কিন্তু বলতে পারলাম না। দোতালায় উঠার জন্য সিঁড়িতে উঠতে আমার বুকের ধুকধুকানি আরও বেড়ে গেল। যত উপরে উঠছি ভয় তত বাড়ছে। কিছুটা ঘামতে শুরু করেছি। খানিকটা সময় পার করতে বললাম, রাজা, আমি না হয় স্যারকে বললাম স্যার আমি আপনার ভক্ত। তারপর স্যার কি প্রশ্ন করতে পারেন?

রাজা চিন্তা করে বলল, স্যার জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন ভক্ত?

কি উত্তর দেব?

তুমিই বলো কি উত্তর দেব।

আমি ভেবে বললাম, বলব তার নাটক উপন্যাস আমার ভালো লাগে।

ঠিক আছে।

আর কোনো প্রশ্ন করবেন কি?

করতে পারেন।

কি প্রশ্ন?

প্রশ্ন করতে পারে, কোন্ নাটক ভালো লেগেছে? কোন্ উপন্যাস ভালো লেগেছে?

নাটক বললে বলব, এই সব দিন রাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময় - এইগুলো।

যদি চরিত্রের কথা বলে?

বাকের ভাইয়ের কথা বলব।

রাজা তাড়াতাড়ি বলল, বাকের ভাইয়ের কথা বললে স্যার রেগে যেতে পারেন। বাকের ভাইয়ের ফাঁসি হওয়া নিয়ে নাকি স্যারের বাসা ভাঙচুর হয়েছিল। স্যারের বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং হয়েছিল। বাকের ভাইয়ের কথা বলা দরকার নেই। বরং বলবে বহুব্রীহিতে মামার চরিত্র।

ঠিক আছে।

আর যদি উপন্যাসের কথা জিজ্ঞেস করেন?

এবার আমি সত্যি বিপদে পড়লাম। হুমায়ূন আহমেদের কোনো উপন্যাসের নাম আমি মনে করতে পারলাম না। শেষে বললাম, তুমি একটা নাম বলো, আমি সেটা বলব।

রাজাও কোনো নাম বলতে পারল না।

আমি নিজে খুব বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে হুমায়ূন আহমেদের কোনো বইয়ের নাম মনে পড়ছে না। শুধু নাটকের নামগুলো মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে। যাইহোক, শেষে সিদ্ধান্ত হলো উপন্যাসের নাম ছাড়াই তার সাথে সাক্ষাৎ করব। অবস্থা বেগতিক হলে কথা বলব না, শুধু সালাম দেব এবং দূর থেকে দেখে চলে আসব।

দোতালায় উঠার পর একজন ছাত্রকে হুমায়ূন আহমেদের রুমের কথা জিজ্ঞেস করতে সে এমনভাবে আমাদের দিকে তাকাল যেন আমরা কোনো ভিন গ্রহের প্রাণী। উল্টো প্রশ্ন করে জানতে চাইল, স্যারের কাছে আপনারা কি জন্য এসেছেন? আপনাদের তো আগে দেখিনি? দেখে তো মনে হয় না আপনারা কেমেস্ট্রির ছাত্র?

প্রশ্নগুলো একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি তখন কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ঐ সময় ফার্মেসি এবং কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে বিশাল দ্বন্দ্ব চলছিল। ১৯৮২ সালের ওষুধ প্রস্তুতসংক্রান্ত এক অধ্যাদেশের একটি ধারা এরকম ছিল যে প্রত্যেক ফার্মাসিউটিক্যালস্ কোম্পানীতে একজন ফার্মাসিস্ট থাকতে হবে। এই অধ্যাদেশটা সম্ভবত প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে পাস হয়। এরশাদ ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পরই কেমিস্টরা ঐ অধ্যাদেশের ঐ ধারা বাতিলের জন্য আন্দোলন শুরু করে। তখন আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। হলে ফামেসি আর কেমিস্ট্রির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত হতো। তবে এটা ফজলুল হক আর শহীদুল্লাহ হলে বেশি হতো। এস এম হলে থাকার কারণে আমি সেটা টের পেতাম না। শুধু গল্প শুনতাম। ফার্মেসির ছাত্র সংখ্যা কম থাকায় আমরা খুব চাপের মধ্যে থাকতাম। এজন্য ভয়ে কেমিস্ট্রির ছাত্রদের ঘাটাতাম না। পরবর্তীতে ঐ আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশে কেমিস্টদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে ঐ আন্দোলন নিয়ে ঢাকা ভার্সিটিতে ১৯৯৫-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত অনেক মিছিল, মিটিং, এমনকি ধর্মঘটও হয়েছে।

যাইহোক, ঐ ছাত্রের প্রশ্ন শুনে আমি তখন আর বলিনি যে আমি ফার্মেসির ছাত্র। কারণ তখন মনে হচ্ছিল হুমায়ূন আহমেদ কেমিস্ট্রির প্রফেসর, আমি ফার্মেসির ছাত্র শুনে আমাকে সে হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা করার অনুমতি নাও দিতে পারে।

উত্তরে শুধু বলেছিলাম, আমরা হুমায়ূন স্যারের ভক্ত, স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি।

ছাত্রটি আমাদের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ডানে একটা রুম দেখিয়ে দিল। রুমটির দরজা খোলা ছিল, সামনের কিছু অংশ ছিল কাঁচের। সেই কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম ভিতরে টেবিলের উপর অনেক বই, তবে চেয়ারটা ফাঁকা। রুমের উপরে অবশ্য কোনো নাম লেখা নেই। জানি না, ওটা হুমায়ূন আহমেদের রুম ছিল কি ছিল না। তবে সেদিন আর তার সাথে আমাদের দেখা হয়নি। আমরা দ্রুত নিচে নেমে এসেছিলাম। কারণ ঐ ছাত্রটি তখনও সন্দেহের চোখে আমাদের দেখছিল। আমার তখন মনে হচ্ছিল সে অনুমান করতে পারছিল যে আমি ফার্মেসির ছাত্র এবং আমাকে ধরতে পারলে......।

৪

আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি জীবন ছিল ১৯৯২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। ফার্মেসির চার বছরের কোর্স শেষ হয়েছিল আট বছরে। প্রথম বছর এস এম হলে থাকলেও ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকে আমি আমার নিজের হল ফজলুল হক হলে চলে আসি। এস এম হলে থাকতে আমি যাদের কাছ থেকে গল্পের বই ধার করতাম তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পাশের রুমের কচি ভাই। তিনি ছিলেন ইকোনোমিকস্ এর মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র এবং হুমায়ূন আহমেদের দারুন ভক্ত। তার টার্গেট ছিল সবার আগে তিনি হুমায়ূন আহমেদের বই পড়বেন। এখন যেমন অধিকাংশ বই ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলায় প্রকাশিত হয়, তখন বছরের বিভিন্ন সময়ে বের হতো। হুমায়ূন আহমেদের বই বের হলে কচি ভাই কীভাবে যেন জেনে যেতেন এবং যত কষ্টই হোক না কেন বই কিনে আনতেন। তার কাছ থেকে ধার করে আমি মাঝে মাঝে বই পড়তাম। তবে সমস্যা ছিল কচি ভাই কাউকে বই ধার দিতে চাইতেন না। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত গম্ভীর এবং বদরাগী ছিলেন। আমাকে তিনি বই ধার দিতেন এই কারণে যে আমি কার্ড খেলায় তার পার্টনার হতাম। এস এম হলে থাকতে আমি প্রথমে কার্ড খেলা শিখি। ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজও তখন শিখি। কচি ভাই বদরাগী হওয়ার জন্য তার সাথে কেউ ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজ খেলায় পার্টনার হতো না। আবার আমাকেও কেউ পার্টনার করত না কারণ আমি তখন ব্রিজ খেলায় নতুন ছিলাম এবং প্রায়ই বড় বড় ভুল করতাম। যেহেতু কচি ভাইয়ের কোনো পার্টনার ছিল না তাই বাধ্য হয়ে তিনি আমাকে তার পার্টনার করতেন। আমি জীবনে শিক্ষকদের কাছে যত বকা খেয়েছে তার থেকে বেশি বকা খেয়েছি কচি ভাইয়ের কাছে। একবার বড় একটা ভুল করায় তিনি আমাকে এমন ধমক দিয়েছিলেন যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে

আমি আর তার সাথে কার্ড খেলব না এবং কথাও বলব না। ঐ ধমকের পর সত্যি আমি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেই।

ব্যাপারটা বুঝতে কচি ভাইয়ের সময় লাগেনি। একদিন দুপুরের পরে আমি বারন্দা দিয়ে যাওয়ার সময় কচি ভাই আমাকে তার রুমে ডাক দেন। আমি তার সামনে গেলে বলেন, কি মোশতাক, কয়েকদিন ধরে তুমি আমার সাথে কথা বলছ না কেন?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আসলে কচি ভাই, পড়াশুনার খুব চাপ শুরু হয়েছে।

তাহলে সন্ধ্যার পর তোমাকে সবসময় টিভি রুমে দেখি কেন?

ঐ সময় হলে হলে ডিশ লাগানো হচ্ছিল। এজন্য সিএনএন, স্টার প্লাস, স্টার মুভি, হিন্দি চ্যানেলগুলো হলের টিভি রুমে বসে দেখা যেত। আমি তখন সন্ধ্যার পর দীর্ঘ সময় টিভি রুমে কাটাতাম। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন কচি ভাই। নিজেকে রক্ষা করতে তার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, মাঝে মাঝে গান শুনি, এজন্য থাকি।

তাতে পড়াশুনার ক্ষতি হয় না?

আমি কোনো কথা বললাম না।

কচি ভাই কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, আজ রাতে তুমি আমার ব্রিজ খেলার পার্টনার হবে।

না না, আমি আর আপনার পার্টনার হব না।

কেন?

ব্রিজ খেলা ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?

অনেক সময় নষ্ট হয়, তাকে পড়াশুনার ক্ষতি হয়।

ফার্স্ট ইয়ারে আবার কি পড়াশুনা? সময় নষ্ট হয়, নাকি আমার ধমক খেয়ে আর খেলতে চাচ্ছ না।

আমি কোনো কথা বললাম না।

কচি ভাই বললেন, ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজ খেলায় ধমক না খেলে তুমি কিছু শিখতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ?

জি।

তাহলে আজ রাতে তুমি আমার পার্টনার হচ্ছ?

ভেবে দেখি।

এতে ভাবাভাবির কি আছে? তুমি আমার পার্টনার হবে এটাই সত্য। এর যেন কোনো এদিক ওদিক না হয়। আর এই যে নাও, হুমায়ূন আহমেদের একটা বই। সাধারণত আমি কাউকে নিজে থেকে হুমায়ূন আহমেদের বই দেই না। কিন্তু তোমাকে দিলাম। কেন দিলাম, জানো?

না জানি না।

আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি এজন্য। যাদেরকে আমি পছন্দ করি তাদেরকে আমি হুমায়ূন আহমেদের বই গিফট্ করি, পড়তে দেই। তোমাকে অবশ্য বইটি গিফট্ করলাম না, পড়তে দিলাম। বুঝতে পেরেছ?

জি।

তাহলে যাও, বইটা পড়ো। পড়ে কেমন লাগে জানিও।

আমি বাইরে এসে বইয়ের নাম দেখলাম, 'নন্দিত নরকে'। আমি তখন জানতাম না হুমায়ূন আহমেদের প্রথম বই ছিল 'নন্দিত নরকে'। তবে সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে আমি কচি ভাইয়ের দেয়া 'নন্দিত নরকে' বইটি পড়িনি। একদিন পর বইটি তাকে দিয়ে শুধু বলেছিলাম 'ভালো লেগেছে'।

কচি ভাই ব্যস্ততার জন্য কোনো কথা বলেননি। বইটি না পড়ার মূল কারণ ছিল কচি ভাইয়ের উপর আমার রাগ। ঐ ধমক খাওয়ার পর তার উপর এত বেশি রেগেছিলাম যে হুমায়ূন আহমেদের বই পেয়েও পড়িনি। এমন কি তার ব্রিজের পার্টনারও আর কোনোদিন হইনি। এরপর অবশ্য যতদিন এস এম হলে ছিলাম কচি ভাইয়ের ভয়ে আর কোনোদিন ব্রিজও খেলিনি।

এস এম হল থেকে ফজলুল হক হলে আসার পর কচি ভাইয়ের সাথে আমার আর কোনোদিন দেখা হয়নি। একবার শুনেছিলাম তিনি বিদেশে চলে গেছেন। আমি জানি না কচি ভাই এখন

কোথায় আছেন। তবে এটুকু জানি, হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুতে যারা সবচেয়ে বেশি ব্যথিত হয়েছেন তাদের মধ্যে কচি ভাই একজন।

ফজলুল হক হলে আসার পর নিয়ম অনুসারে আমাকে প্রথমে এক্সটেনশন বিল্ডিংএ সিট দেয়া হয়। সেখানে এক রুমে চারটি সিট ছিল। সিট চারটি হলেও সবগুলোতে ডবলিং করতে হতো। অর্থাৎ এক সিটে দুইজন এবং এক রুমে আটজন। সিট না থাকার কারণে কোনো কোনো রুমে আটজনের বেশিও থাকত। ঐ সময় ফেব্রুয়ারি মাসে বিকেলে সময় কাটানোর সবচেয়ে সহজ এবং জনপ্রিয় উপায় ছিল বাইমেলায় হেঁটে বেড়ানো। এখন বই মেলা বাংলা একাডেমির ভিতরে অনুষ্ঠিত হয়। তখন বইমেলা হতো দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি স্টল থাকত। বিকেল হলে যারা টিউশনি করত না তারা চলে যেত বইমেলায়। আমাদের রুমের মধ্যে যে আটজন ছিল তাদের মধ্যে একজনের অভ্যাস ছিল বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদের বই চুরি করা। সঙ্গত কারণেই নাম উল্লেখ করছি না। ধরে নেই তার নাম 'হুমায়ূন বন্ধু'। মানুষের অনেক রকম স্বভাব থাকে। কিন্তু হুমায়ূন বন্ধুর স্বভাব আমাকে সত্যি বিস্মিত করত। তার টাকা পয়সার কোনো অভাব ছিল না। এমন কি স্বভাব চরিত্রও ছিল খুব ভালো। ছাত্রও মেধাবী। কিন্তু তার শখ হুমায়ূন আহমেদের বই চুরি করা। ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হলে বিকেলে সে ঐ বই মেলায় যাবে। যতদিন সে হুমায়ূন আহমেদের নতুন প্রকাশিত সবগুলো বই চুরি করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত তার শান্তি নেই। 'হুমায়ূন চোর' হিসেবে সে হলে বেশ পরিচিত ছিল। কোনো কোনো বই মেলায় সে হুমায়ূন আহমেদের সবগুলো বই চুরি করতে পারত, কোনো কোনো বই মেলায় পারত না। তার এই স্বভাবের ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। মেডিকেল সায়েন্সে ক্লিপটোমেনিয়া (Kleptomania) নামের একটা শব্দ আছে। এই ক্লিপটোমেনিয়ার অর্থ চুরির অভ্যাস। এই ধরনের রুগীরা পছন্দের কোনো কিছু দেখলে সেটা চুরি না করা পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে পারে না। আমার ঐ হমায়ূন বন্ধুকে ঠিক ক্লিপটোমেনিয়ার রুগী বলে মনে হতো না। কারণ সে শুধু হুমায়ূন আহমেদের বই চুরি করত এবং তা শুধু বইমেলা থেকে, অন্য কোথাও থেকে নয়।

হুমায়ূন বন্ধুর হুমায়ূন আহমেদের বই চুরি করার ঘটনাটা আমার ভালো না লাগলেও কেন যেন আবার খারাপও লাগত না। আমরা সবাই বেশ মজা পেতাম। আমি মজা পেতাম এ কারণে যে হুমায়ূন বন্ধুর চুরি করা বই আমি নিজেও পড়তাম। পড়ে এত আনন্দ পেতাম যে আমার ঐ হুমায়ূন বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম।

কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে একদিন হুমায়ূন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি হুমায়ূন আহমেদের বই চুরি কর কেন?

হুমায়ূন বন্ধু বলল, আমি জানি না। ইচ্ছে হয়, তাই করি।

ব্যাপারটা কেমন না?

জানি ব্যাপারটা খারাপ। কিন্তু এতে কারো বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয় না। এক স্টল থেকে একটা করে বই নেই। তারপর সবাইকে পড়তে দেই। সবাই পড়ে যে আনন্দ পায় সেই আনন্দ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

তোমার তো অনেক টাকা। বইগুলো কিনে দিতে পার।

কষ্ট করে পেতে ভালো লাগে। এজন্য চুরি করি।

যদি ধরা পড়ো।

পড়লে কিছু হবে না।

কীভাবে নিশ্চিত হলে?

আমার সাথে সবসময় চারপাঁচজন থাকে। ধরা পড়লে ওরাই হইচই করে উল্টাপাল্টা কিছু একটা করে ফেলবে। শেষে স্টল মালিক বই ফেরত পেলেই খুশি হবে। আর কিছু করবে না।

তোমার কি সত্যি খারাপ লাগে না?

হুমায়ূন বন্ধু নির্লিপ্তভাবে বলল, না লাগে না।

কেন?

কারণ বইগুলো আমার সংগ্রহে থাকে না। তুমি দ্যাখো, আমার কাছে কোনো বই আছে? না, নেই। যেগুলো চুরি করেছি তার সবগুলোই হলের কোনো না কোনো ছাত্র নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার সময় তারা আমাকে বলে নেয়নি, এখন ফেরতও দিচ্ছে না। এটা এক ধরনের চুরি, তাই

না? অর্থাৎ হুমায়ূন আহমেদের বই চুরি করার মতো অনেক চোর আছে। আমি বড় চোর, আর অন্যরা ছোট চোর। মজার ব্যাপার হলো সবাই শিক্ষিত। অবাক ব্যাপার, তাই না?

আমি কি বলব কিছু বুঝতে পারলাম না।

হুমায়ূন বন্ধু বলল, আসলে কি জানো, যে হুমায়ূন আহমেদের বই একবার পড়েছে সে কোনো না কোনোভাবে হুমায়ূন চোর হয়ে গেছে। কারণ হুমায়ূন আহমেদের বই দেখলেই তার পড়তে ইচ্ছে করবে। যদি সামর্থ থাকে সে বইটি কিনে পড়বে, না থাকলে ধার করে পড়বে, আর সেটা সম্ভব না হলে চুরি করবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তাকে বইটি পড়তেই হবে।

সবাই যে এরকম করবে তা কিন্তু ঠিক না।

তুমি প্রমাণ চাও?

আমি সম্মতি দিয়ে বললাম, হ্যাঁ চাই।

তাহলে রাতে আমার সাথে কথা বলো। এ কথা বলে হুমায়ূণ বন্ধু চলে গেল। রাতে সে হুমায়ূন আহমেদের তিনটি বই নিয়ে ফিরল। ঐ বই তিনিটির সাথে আরও চারজন লেখকের চারটি বই মিলে মোট সাতটি বইয়ের গাদা করা হলো। এই বই সাতটি সে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বলল, দেখবে আগামী দুই দিন পর কি ঘটে?

দুই দিন লাগল না। দেড় দিন পর দেখা গেল টেবিলে হুমায়ূন আহমেদের একটি বইও নেই। সেগুলো একজন থেকে অন্যজনের হাতে ঘুরতে শুরু করেছে। আর অন্য লেখকদের চারটি বই তখনও টেবিলে পড়ে আছে।

৫

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে থাকার সময় আমি হুমায়ূন আহমেদের খুব কাছাকাছি ছিলাম। আমার ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট ছিল হুমায়ূন আহমেদেরে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সাথে লাগোয়া। হুমায়ূন আহমেদ যে শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর ছিলেন সেই হল ছিল আমার ফজলুল হক হলের সংলগ্ন। হুমায়ূন আহমেদ প্রতি বছর বই মেলায় আসতেন। আর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় প্রতিদিন বিকেলে আমি বই মেলায় ঘুরতে যেতাম। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও কখনোই হুমায়ূন আহমেদের দেখা পাইনি।

১৯৯৪ সালে যখন ফজলুল হক হলে উঠি তখন একদিন শহীদুল্লাহ হলের পাশ দিয়ে চাঁনখারপুলের দিকে যাওয়ার সময় আমার এক বন্ধু শহীদুল্লাহ হলের একটি আবাসিক ভবন দেখিয়ে বলেছিল, এখানে হুমায়ূন আহমেদ থাকতেন।

আমি বলেছিলাম, তুমি জানলে কীভাবে?

আমাকে এই হলের একজন হাউস টিউটর বলেছেন।

এখন উনি থাকেন না?

না, নিজের ফ্ল্যাটে উঠেছেন। বাকের ভাইয়ের ফাঁসি হওয়ার সময় যখন এই হলে আন্দোলন হচ্ছিল তখন তিনি হল ছেড়েছিলেন। অবশ্য আন্দোলনের পরে এসেছিলেন, কিন্তু খুব বেশিদিন থাকেননি।

এরপর থেকে শহীদুল্লাহ হলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই ঐ আবাসিক ভবনের উপর আমার চোখ পড়ত আর মনে হতো এখানে হুমায়ূন আহমেদ থাকতেন। কেন এমন হতো জানি না। হয়তো হুমায়ূন আহমেদের লেখা ভালো লাগত এজন্য। হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের ভালো লাগা নিয়ে অনেক ঘটনা, অনেক গল্প আছে। এরকম একটি ঘটনা বা গল্প কারো কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম ।

> দুই বন্ধু মিলে ঠিক করেছে তাদের অন্য এক বন্ধুকে জন্মদিনে বই উপহার দেবে। তাদের কথপোকথন ছিল নিম্নরূপ,
>
> প্রথম বন্ধু বলল, কি বই দেই বল তো?
>
> দ্বিতীয় বন্ধু বলল, হুমায়ূন আহমেদের বই কিনে দে।
>
> প্রথম বন্ধু বিরক্ত হয়ে বলল, আরে দূর! হুমায়ূন আহমেদের বই কিনে দেব কেন?

দ্বিতীয় বন্ধু অবাক হয়ে বলল, হুমায়ূন আহমেদ কতটা জনপ্রিয় জানিস? তার বই পেলে সবাই খুশি হয়।

প্রথম বন্ধু এবার জোর দিয়ে বলল, এজন্যই তো কিনে দেব না। হুমায়ূন আহমেদের বই সবার পড়া। উপহার দিলে দেখবি আগেই সেই বইটা পড়ে ফেলেছে। শেষে আমাদের গিফট্ দেয়াটা ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুর সাথে একমত পোষণ করল।

উপরের গল্প কিংবা ঘটনা থেকে বোঝা যায় আসলে হুমায়ূন আহমেদ পাঠকের কাছে কতটা জনপ্রিয়। গল্পটা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু কাকতালীয়ভাবে আমার জীবনেই ওরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটা ১৯৯৪ সালের। আমার বন্ধু হেলালের জন্মদিন। হেলাল আর আমি একসাথে বিএল কলেজে পড়তাম। হেলাল ভর্তি হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ওর জন্মদিনে হঠাৎই দাওয়াত পেলাম। কি গিফট্ দেব চিন্তা করতে গিয়ে শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম হুমায়ূন আহমেদের বই গিফট্ দেব। সত্যি কথা বলতে কি ততদিনে আমি হুমায়ূন আহমেদের বেশ কিছু বই পড়লেও কোনো বই কিনে পড়িনি।

বই কেনার জন্য নীলক্ষেত গেলাম। গল্পের বই আছে এরকম একটা দোকানে গিয়ে বললাম, ভাই, হুমায়ূন আহমেদের একটি বই দিন।

দোকানদার হুমায়ূন আহমেদের অনেকগুলো বই বের করে দিয়ে বলল, বই দিয়ে কি করবেন?

বন্ধুর জন্মদিনে গিফট্ করব।

তাহলে হুমায়ূন আহমেদের বই গিফট্ করবেন কেন? তার বই সবার পড়া। এই বইটি গিফট্ করুন।

আমি জোর দিয়ে বললাম, না আমি হুমায়ূন আহমেদের বই কিনব। এই বইয়ের লেখককে আমি চিনি না।

এই বইয়ের লেখক মুহাম্মাদ জাফর ইকবাল। হুমায়ূন আহমেদের ছোট ভাই। খুব ভালো লিখেন। একটা বই গিফট্ করে দেখুন। যাকে দিবেন সে আপনার খুব প্রশংসা করবে।

আমি কি মনে করে সেদিন জাফর ইকবাল স্যারের বইটি কিনেছিলাম। হুমায়ূন আহমেদের বই আর কেনা হয়নি।

জাফর ইকবাল স্যারের ঐ বইটি ছিল ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা একটা বই। হলে এসে প্রথমে আমি নিজে বইটি পড়ি এবং পরের দিন হেলালকে গিফট্ করি। এতদিন পরে বইটির নাম মনে নেই, তবে বইটি ছিল অসাধারণ। কয়েকজন কিশোর মিলে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচিয়ে তোলে। সেই থেকে আমি জাফর ইকবাল স্যারেরও ভক্ত হয়ে পড়ি।

২০১১ সালে একবার আমার এক জুনিয়র সহকর্মীর বিয়েতে আমি ঠিক করলাম তাকে কিছু বই উপহার দেব। বাস্তবে সে খুব বই পড়ুয়া ধরনের। আমি অনেক লেখকের বই কিনলাম। সেই বইগুলোর মধ্যে একটি ছিল হুমায়ূন আহমেদের ’হিমু সমগ্র’। বিয়ের দিন দশেক পর সে যখন ছুটি থেকে ফিরে এলো তখন তার সাথে নানা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে আমাকে জানাল, আমার গিফট্ পেয়ে সে খুব খুশি। তবে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি দুর্ঘটনা?

স্যার আপনি আমাকে অনেকগুলো বই গিফট করেছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।

ঐ বইগুলোর মধ্যে হিমু সমগ্র ছিল।

হ্যাঁ ছিল।

বইটি আমি দেখেছিলাম। তারপর হঠাৎই বইটি হাওয়া হয়ে গেল।

হাওয়া হয়ে গেল মানে!

গিফট্ খোলার দায়িত্বে যারা ছিল সম্ভবত তাদের কেউ বইটি নিয়ে গেছে।

ফেরত দেয় নি?

ফেরত দেয়ার মানসিকতা থাকলে তো অনুমতি নিয়ে নিত। যেহেতু বলে নেয়নি তারমানে গায়েব করে দিয়েছে। অন্য বইগুলো ঠিকই আছে।

কি অদ্ভুত ব্যাপার?

স্যার, আপনি আমাকে মিসির আলীর ঠিকানা দিন। আমি তাকে ঘটনাটা বলি। নিশ্চয় তিনি জানার পর খুব বিস্মিত হবেন এবং এই রহস্য উম্মোচনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

কথাটা শুনে আমরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। মিসির আলী হিমুকে খুঁজলে মন্দ হবে না!

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা বিষয়ে এই ঘটনাটিকে সত্যি আমার কাছে অনেক বড় একটা ঘটনা মনে হয়। তবে যে ব্যক্তি বইটি নিয়ে গিয়েছে তাকে আমি কখনোই দোষ দেই না। কারণ সে হয়তো আমার ভার্সিটি হলের 'হুমায়ূন বন্ধুর' মতো আর এক হুমায়ূন বন্ধু যে কিনা হুমায়ূন পড়তে ভালোবাসে।

৬

পলিনের সাথে আমার পরিচয় ১৯৯৯ সালে। তারপর থেকে দুজনের প্রেম এবং অবশেষে ২০০৫ সালে আমরা বিয়ে করি। অর্থাৎ দীর্ঘ ছয় বছরের প্রেম পরবর্তী পরিণয়ে নতুন জীবনের শুরু। ঐ ছয় বছরের প্রত্যেক বছরে আমি কমপক্ষে দু'বার পলিনকে গিফট্ দিতাম। প্রথম গিফট্ ছিল ভ্যালেন্টাইনস্ ডেতে এবং দ্বিতীয় গিফট্ ছিল জন্মদিনে। ঐ গিফট্ কেনাকে আমার সবেচেয় কঠিন কাজ মনে হতো। কারণ কি গিফট্ দেব সেটা খুঁজে পেতাম না। যদিও পলিনের কোনো পছন্দ অপছন্দ থাকত না, তারপরও একবার মনে হতো এটা দেই, আর একবার মনে হতো ওটা দেই। ২০০১ সালের ভ্যালেন্টাইনস্ ডের গিফট নিয়েও ওরকম দোটানায় ছিলাম। এ সময় কথা প্রসঙ্গে যখন জানতে পেরেছিলাম পলিনও হুমায়ূন আহমেদের বই পড়তে পছন্দ করে। তখন ঠিক করলাম হুমায়ূন আহমেদের অটোগ্রাফসহ একটা বই পলিনকে উপহার দেব। এরকম একটা উপহার যে সবসময় উপহার গ্রহণকারীকে বিস্মিত করে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। পরবর্তীতে আমি নিজেও একবার এরকম অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। ঘটনাটা ২০১১ সালের বইমেলার শেষ দিকের। বিকেলে আমি নালন্দা প্রকাশনীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় এক উঠতি বয়সী ছেলে এসে সুন্দরভাবে আমাকে সালাম দিল। আমি সালামের উত্তর দিতে সে ঐবার প্রকাশিত আমার সবগুলো বই সামনে ধরে বলল, ভাইয়া আমাকে বইগুলোতে অটোগ্রাফ দিবেন।

আমি কি নামে অটোগ্রাফ দেব জানতে চাইলে ছেলেটি লাজুক হেসে একটি মেয়ের নাম বলল।

আমি জিজ্ঞেস করে বললাম, কে?

উত্তরে আরও লাজুকভাবে ছেলেটি বলল, আমার ফিয়ান্সি, আপনার বই খুব পছন্দ করে। ওর খুব ইচ্ছে ছিল আপনার কাছ থেকে বই কিনবে। কিন্তু কয়েকবার মেলায় এসেও আপনাকে পায়নি। আপনার অপেক্ষায় থেকে বইগুলো ওর আর কেনা হয়নি। আপনি বইমেলায় একেবারেই আসেন না। আজ হঠাৎ আপনাকে পেয়ে গেলাম। তাই আপনার অটোগ্রাফ নিয় নিচ্ছি। বইগুলো ওকে গিফট্ করলে ও খুব খুশি হবে।

আমার মতো নবীন লেখকের জন্য এর থেকে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে! আমি বইগুলোতে স্বাক্ষর করে যখন ছেলেটিকে দিলাম তখন সে বলল, ভাইয়া, যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ করব।

আমি বললাম, করুন।

ভাইয়া, ওর জন্মদিনে আপনি ওর সাথে ফোনে একটু কথা বলবেন।

আমি কীভাবে কথা বলব? আর সেটা কি ঠিক হবে?

আমি আপনাকে ফোন করব, আর আপনি শুধু ওকে উইশ করবেন।

আমি রাজি হলাম এবং আমার ফোন নম্বর দিলাম। ছেলেটির ফোন নম্বরও আমার মোবাইলে সেইভ করে নিলাম।

এরপর মাস তিনেক পর আমি ছেলেটির ফোন পেলাম। ফোনে সে মনে করিয়ে দিল আগামীকাল রাতে তার প্রেমিকার জন্মদিন এবং রাত বারোটা এক মিনিটে সে আমাকে ফোন করবে। খুব অনুরোধ করে বলল, আমি যেন জেগে থাকি।

আমি বললাম, থাকব।

রাতে ঠিক বারোটা এক মিনিটে আমার ফোনে ছেলেটি ফোন করল। আমি ফোন ধরতে সে পরিচয় দিয়ে কল ডাইভার্ট করে তার প্রেমিকা মেয়েটিকে দিল। আমি মেয়েটিকে 'হ্যাপি বার্থ ডে'

বলে উইশ করলাম এবং আরও কিছু কথা বললাম। মেয়েটির কথা শুনে বোঝা যাচ্ছিল সে সত্যি দারুন খুশি। এতটা খুশি ছিল যে সে ঠিক মতো কথা বলতে পারছিল না।

আমার সেদিন সত্যি খুব ভালো লেগেছিল। কারণ আমি একজন মানুষকে খুশি করতে পেরেছিলাম। এরপর ২০১২ সালে ছেলেটির সাথে আবার আমার মেলায় দেখা হয়। আমি তাকে চিনতে পারেনি। সেই আমাকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, ভাইয়া আমাকে চিনতে পেরেছেন?

আমি তাকিয়ে আছি দেখে সে বলল, আমি গত বছরের সেই ছেলেটি যে আপনাকে রাত বারোটায় ফোন করে আমার ফিয়ান্সিকে বার্থ ডে তে উইশ করতে অনুরোধ করেছিলাম।

আমি মনে করতে পেরে বললাম, কেমন আছেন আপনি? আপনার ফিয়ান্সি কেমন আছে?

ছেলেটি মন খারাপ করে বলল, ভালো নেই ভাইয়া। আর ওর কথা বলছেন, ও চলে গেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, চলে গেছে মানে!

জি ভাইয়া। অন্য এক সময় আপনাকে বলব।

এই বলে ছেলেটি মন খারাপ করে চলে গেল। আমি একেবারে বিস্মিত হয়ে বসে থাকলাম। এত সহজে এত সুন্দর একটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল! যে ছেলেটি কিনা এত কষ্ট করে তার প্রেমিকাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে - তার সব কষ্ট বৃথা হয়ে গেল।

ঘটনাটা কষ্টদায়কই বটে। তবে ছেলেটি প্রেমে পড়ে যা করেছিল তা বোধহয় অধিকাংশ প্রেমিকই করতে চেষ্টা করে। যেমন আমি করেছিলাম। ২০০১১ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পলিনকে আমি হুমায়ূন আহমেদেরে অটোগ্রাফ দেয়া একটা বই উপহার দেব। ঐ সময় আমি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ে চাকরি করতাম। অফিস ছিল ধানমন্ডি সাত নম্বর রোডে। আর বাসা ছিল কলাবাগান। চাকুরিরত অবস্থায় বই মেলায় এসে হুমায়ূন আহমেদের অটোগ্রাফ নেয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ উনি কবে, কখন, কোথায় আসেন তা নির্দিষ্ট ছিল না।

তবে শুনেছিলাম কিংবা কোনোভাবে জেনেছিলাম শুক্রবার তিনি মেলায় আসেন। কিন্তু কখন আসেন তা জানা ছিল না। তাই সারাদিন আমি তখন মেলায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই পরিকল্পনা মতো আমি সকালে মেলায় হাজির হয়ে যাই। কিন্তু কোন্ স্টলে তিনি বসবেন তা আমার জানা ছিল না। এখনকার মেলায় প্রত্যেক প্রকাশককে নিজের প্রকাশনার প্রকাশিত বই বিক্রি করতে হয়। তখন ঐ রকম ছিল না। সব স্টলেই হুমায়ূন আহমেদের বই পাওয়া যেত। ঐবার বাংলা একেডেমির ভিতরে পুকুরের পাড়ে আমি একটা স্টলে শুধু হুমায়ূন আহমেদের বই বিক্রি করতে দেখেছিলাম। সম্ভবত ঐ স্টলটা ছিল অন্য প্রকাশের। তখন অতটা ভালো মতো খেয়াল করিনি। কারণ প্রকাশনার থেকে বইয়ের গুরুত্ব আমার কাছে বেশি ছিল, আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ছিল লেখকের। আমি এমনভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যেন হুমায়ূন আহমেদ আসামাত্র আমি হুমায়ূন আহমেদের অটোগ্রাফ নিতে পারি। তা না হলে লম্বা লাইনের পিছনে দাঁড়াতে হবে।

আমি তখনও কোনো বই কিনিনি। কারণ আমার ভয় ছিল হুমায়ূন আহমেদের সামনে থেকে বই না কিনলে তিনি যদি অটোগ্রাফ না দেন। পকেটে টাকা থাকায় বই কেনা নিয়ে কোনো চিন্তা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, হুমায়ূন আহমেদের বই কিনে পড়েছি আমি অনেক পরে। আসলে আমি আমার প্রথম জীবনে বই একেবারেই কিনতাম না। তবে আমি প্রচুর বই পড়েছি। এই পড়ার পদ্ধতিকে যদি ভাগ করতে হয় তাহলে তিনভাগে ভাগ করতে হবে। এগুলো হলো - ভাড়ায় পড়া, ধারে পড়া এবং কিনে পড়া।

১৯৯২ সালের আগ পর্যন্ত আমি সব বই পড়তাম ভাড়ায়। খুলনা জিলা স্কুলে যাওয়ার পথে একটা দোকান ছিল যেখানে দুই টাকায় বই ভাড়া পাওয়া যেত। ঐ সময় এমনও দিন গেছে আমি দিনে তিনটা পর্যন্ত বই পড়তাম। যে দোকানদার বই ভাড়া দিত সে খুশি হয়ে মাঝে মাঝে আমাকে একটা দুটো বই বিনা ভাড়ায় পড়তে দিত। কারণ আমি ছিলাম তার সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট।

১৯৯২ সালের পর ধার করে বই পড়া আমার অভ্যাস হয়ে উঠে। হলে অনেক ছাত্র থাকায় কারো কাছে না কাছে বই থাকত। সেই বইগুলো জোগাড় করে আমি পড়তাম। বই পড়ার ওস্তাদ ছিল আমার ব্যাচমেট সাইফুল। ওর কাছে সবসময় বই পাওয়া যেত। ও ছিল আমার অন্যতম বইয়ের জোগানদাতা। তবে ওর বইগুলো খুব মোটা মোটা হওয়ায় আমি অন্যদের রুমেও উকি ঝুকি মারতাম। বইয়ের কখনোই অভাব হতো না আমার। এজন্য তখন একেবারেই বই কেনা হতো না, এমন কি বইমেলায় গেলেও বই কিনতাম না। অন্যরা কিনত, আর আমি পড়তাম।

আমি বই কিনতে শুরু করি ২০০৫ সালের পর থেকে। বইমেলার প্রথম দিন থেকেই আমার বই কেনা চাই। বলতে দ্বিধা নেই সবার আগে হুমায়ূন আহমেদ আর জাফর ইকবাল স্যারের বই কিনি। তারপর ধীরে ধীরে অন্য বই কিনতে থাকি। এখন আমার বই কিনে পড়ার যুগ চললেও গিফট্ও পাই প্রচুর বই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বই পড়া হয় না। কেন যেন শুধু হুমায়ূন আহমেদ আর জাফর ইকবাল স্যারের বইগুলো পড়া হয়। সামনের বছরগুলোতে কি হবে জানি না। কারণ হুমায়ূন আহমেদের নতুন বই আর মেলায় আসবে না। হয়তো তখন হুমায়ূন আহমেদের ভালোলাগার পুরাতন বইগুলো বার বার কিনব!

আবার হুমায়ূন আহমেদের অটোগ্রাফ নেয়ার ঘটনায় ফিরে আসি। আমি ২০০১ সালের ঐ শুক্রবার সকাল থেকে খুব সতর্ক ছিলাম। হুমায়ূন আহমেদ এসে আবার চলে না যান। ঐ দিন হুমায়ূন আহমেদ আসবেন কিনা সহজেই আমি স্টলের মালিককে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারতাম। কিন্তু করিনি। খুব বেশি লজ্জা লাগছিল। সম্ভবত প্রেমিকার জন্য বই কিনব বলে। মনে হচ্ছিল বিক্রেতাদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে সাথে সাথে জেনে যাবে আমি কার জন্য বই কিনছি।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে গেল, হুমায়ূন আহমেদ এলেন না। দুপুর পেরিয়ে যখন বিকেল হলো তখনও যখন হুমায়ূন আহমেদ এলেন না সত্যি মনটা খারাপ হয়ে গেল। এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মেলার মধ্যে। আরও অনেক লেখকদের দেখলাম সেদিন। কিন্তু শুধু একজনকে দেখলাম না, পেলামও না। আর তিনি হলেন হুমায়ূন আহমেদ। রাত আটটা পর্যন্ত যখন তিনি এলেন না, তখন নিশ্চিত হলাম আর তিনি আসবেন না।

রাগে হুমায়ূন আহমেদের বই কিনব না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম এবং শেষ পর্যন্ত আর কিনলামই না। হুমায়ূন আহমেদকে দেখার এটা ছিল আমার চতুর্থ প্রচেষ্টা, কিন্তু কি এক অজানা কারণে তাঁর সাথে আমার আর দেখা হলো না।

ঐবার ভ্যালেন্টাইনস্ ডে তে পলিনকে আমি নতুন লেখকের নতুন একটা বই গিফট্ করেছিলাম। বইয়ের নামটা ছিল খুব সুন্দর, কিন্তু ভিতরের গল্পটা সুন্দর কিংবা উপভোগ্য ছিল না। শেষে পরে অনেকবার মনে হয়েছে, কেন আমি সেদিন পলিনকে হুমায়ূন আহমেদের একটা বই কিনে দেই নি? যদি দিতাম তাহলে সত্যি আমার জীবনে প্রথম হুমায়ূন আহমেদের বই কেনা হতো এবং সেটা পলিনকে গিফট্ করা হতো। এই আফসোসটা আমার এখনও আছে! হয়তো সারা জীবনই থাকবে!

৭

হুমায়ূন আহমেদের খুব বেশি বই যে আমি পড়েছি তা কিন্তু নয়। হয়তো সত্তর আশিটি হবে, কিংবা কিছু কম বেশি হতে পারে। শুনেছি তিনি ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিনশ বিশটির মতো বই লিখেছেন। এত বই পড়া সত্যি দুরহ ব্যাপার। কীভাবে তিনি এত বই লিখেছেন সেটাও এক রহস্য। শুনেছি তিনি একদিন-দুইদিনে বই লিখে ফেলতেন, যা ছিল তার অন্য এক রহস্যময় ক্ষমতা। সত্যি কথা বলতে কি হুমায়ূন আহমেদ নিজেই এক রহস্য। আমার কাছে তিনি Simply A Mysterious Man.

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম কোন বইটি আমি পড়েছি সঠিকভাবে মনে করতে পারছি না। তবে যতদূর মনে পড়ে এবং আমার ভুল না হয়ে থাকে এক্সরসিস্ট বইটির অনুবাদ করেছিলেন তিনি। বইটি পড়ার জন্য ভাড়া করে এনেছিলাম। ঐ বইটি তাঁর অনুবাদকৃত আমার পড়া প্রথম বই হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তবে মৌলিক বই কোনটি পড়েছিলাম মনে নেই। নন্দিত নরকে বইটি পড়েছিলাম অনেক পরে। কীভাবে যেন ফজলুল হক হলে থাকতে আমি নন্দিত নরকের ইংরেজি অনুবাদটি পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন বইটি আমি পড়ি। সত্যি দারুন ভালো লেগেছিল।

ভার্সিটি জীবনে যখন ছুটিতে ফরিদপুরে আমাদের বাড়ি যেতাম তখন সবচেয়ে বিরক্ত লাগত লঞ্চে পদ্মা নদী পার হতে। লঞ্চে মাঝে মাঝে দুই ঘণ্টা লেগে যেতে। ঐ সময়টা সুন্দরভাবে পার করার জন্য আমি আগেই কারো কাছ থেকে ধার করে হুমায়ূন আহমেদের বই নিয়ে যেতাম। তারপর লঞ্চে উঠে সিট বা বেঞ্চে না বসে লঞ্চের পিছনে যেখানে ধোঁয়া বের হয় তারও ওপাছে একটা দোতলা মত খোলা জায়গা থাকে। সেখানে কোনো ভীড় বা ঠেলাঠেলি হয় না। সেই জায়গায় রেলিংএ হেলান দিয়ে বসে হুমায়ূন আহমেদের বই পড়তাম। তখন কীভাবে যে ঐ দুই ঘণ্টা পার হয়ে যেত তা আমি নিজেও বুঝতে পারতাম না। মাঝে মাঝে মনে হতো নদী পার হতে সময় আরও বেশি লাগুক। একবার বাড়ি থেকে ঢাকা আসার সময় হিমুর কোনো একটা পর্ব পড়া শেষ হওয়ার আগেই

লঞ্চ মাওয়া ঘাটে এসে থামে। তখন বিআরটিসিতে করে মাওয়া থেকে ঢাকা আসতে হতো। গল্পের টান এত বেশি ছিল যে বইটি না পড়ে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার একটা সমস্যা হচ্ছে দ্রুত গতির কোনো বাহনে দীর্ঘক্ষণ পড়তে পারি না। বিশেষ করে প্রাইভেট কার, বাস, ট্রেন কিংবা প্লেনে। মোসন সিকনেস্ (Motion Sickness) হওয়ার কারণে মাথা ব্যথা শুরু হয়, সাথে বমি বমি ভা সৃষ্টি হয়। ঐবার গল্পের টানের কারণে সেদিন আমি থাকতে পারিনি। বিআরটিসি বাসে বসেই হিমুর বাকি অংশ পড়তে শুরু করি। তারপর যা হওয়ার তাই হলো। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো মাথা ব্যথা। আমি বই বন্ধ করেও মুক্তি পেলাম না। বমি করতেই হলো। ভাগ্যিস জানালার পাশে বসেছিলাম, তা না হলে বিচ্ছিরি কান্ড ঘটে যেত। আমার জীবনে গত বিশ পঁচিশ বছরে ওটাই গাড়ির মধ্যে ছিল প্রথম এবং শেষ বমি। এরকম হতে পারে জেনেও কেন ঐ দিন গাড়িতে হিমু পড়েছিলাম - তার একটাই উত্তর, হুমায়ূন আহমেদের লেখার যাদু।

হুমায়ূন আহমেদের মানুষকে সম্মোহিত করার ক্ষমতা কতটুকু তা আমি আমার বাস্তব জীবন থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই। আমি প্রতিদিন সকালে নিয়মিত লেখালেখি করি। সকাল ছয়টা থেকে আটটা আমার লেখার সময়। কিছু কিছু গল্পের টান খুব বেশি থাকলে এত অল্প সময়ে লিখে মন ভরে না। তখন আমি লেখার জন্য পাগল হয়ে উঠি। ঐ সময় যেভাবেই হোক আমাকে লিখতে হয়। ২০১০ সালের প্রথম দিকে আমি যখন ওয়ারি ডিভিশনের এডিসি তখন রাত দুইটার দিকে আমার এরকম লেখার নেশা উঠল। দিনটি ছিল বৃস্পতিবার দিবাগত রাত। আমি কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। বাসায় বসে একাধারে লেখা যাবে না, এরকম চিন্তা মাথায় ঢুকতে রাজারবাগ থেকে আমার ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে আসতে বললাম। বাসায় শুধু জানালাম অফিসের কাজে বাইরে যেতে হবে। তারপর সরাসরি অফিসে চলে এলাম। ওয়ারি ডিভিশনে আমার অফিসটি ছিল খুব সুন্দর। রাতে ড্রাইভার বডিগার্ডকে বিদেয় করে দিয়ে আমি লিখতে বসি। তারপর একেবারে জুম্মার নামাজের আগ পর্যন্ত লিখি। এরপর শান্ত হয় মনটা। এটাই হলো আমার লেখার নেশা। এরকম নেশা উঠলে আমাকে অন্যদিকে মনোযোগি করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ে।

২০১২ সালের অক্টোবর মাসে আমি যখন দার্ফুরের মুহাজিরিয়া টিম সাইটে কর্মরত ছিলাম তখন আমার ঐরকম এক লেখার নেশা উঠেছিল। অফিসে কাজের চাপ খুব কম থাকায় আমি তখন অফিসে বসেই লিখতাম। অফিস আর আমার টেন্ট (এক ধরনের তাবু) যেখানে আমি ঘুমাতাম ছিল একই ক্যাম্পাসে, মধ্যবর্তী দূরত্ব মাত্র চল্লিশ গজ । আমি ঐদিন সকাল থেকে লিখতে শুরু করি। আমি বুঝতে পারছিলাম আজ সারাদিনেও আমার ঐ লেখার নেশা কাটবে না। লেখার নেশাটা এমন ছিল যে কিছু খেতেও ইচ্ছে করছিল না। দুপুরে বাংলাদেশি দুই সহকর্মী আমাকে জোর করে খেতে নিয়ে যায়। খাওয়ার পর টেন্টে গিয়েছিলাম পানি খেতে। আমার গ্লাসটা রুমে থাকত এবং রুমে পানি খেতাম। কিন্তু খাওয়া দাওয়া করতাম আমার ঐ দুই সকর্মীর টেন্টে।

পানি খাওয়ার সময়ও আমি খুব তাড়াহুড়া করছিলাম। কারণ আমার মধ্যে তখন লেখার নেশা কাজ করছে। বুঝতে পারছিলাম পৃথিবীর কোনো শক্তি তখন আমাকে লেখা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আমি বিছানায় বসে পানি খাচ্ছিলাম। পানি খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন বিছানার উপর রাখা মিসির আলী অমনিবাস বইটির উপর নজর পড়ল। এই বইতে মিসির আলির সাত আটটি গল্প ছিল। দেশ থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছিলাম। কি মনে করে বইটি হাতে তুলে নিলাম। তারপর গল্পগুলোর উপর চোখ বুলালাম। কয়েকটি গল্প আগে পড়া ছিল, বাকিগুলো পড়া ছিল না। প্রথম যে গল্পটি সেটির নাম 'দেবি'। গল্পটি আমি আগে পড়িনি। প্রথম লাইন পড়তে কি যে হলো বলতে পারব না, আমি পড়তে শুরু করলাম।

এক সময় লক্ষ্য করলাম আমি বসা থেকে শুয়ে পড়েছি এবং শুয়ে শুয়ে পড়ছি। 'দেবি' গল্পটি যতই পড়ছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। শুরু হলো আমার মনের মধ্যে এক যুদ্ধ। আমার লেখার টান আর হুমায়ূন আহমেদের 'দেবি' গল্পের টানের যুদ্ধ। যুদ্ধটা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ হুমায়ূন আহমেদের 'দেবি' গল্পের টান এত বেশি ছিল যে আমার লেখার টান অল্প সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মহুতি দিল। সময়টা তখন দুপুর আড়াইটা হবে। সন্ধ্যার দিকে আমি যখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম ততক্ষণে দ্বিতীয় গল্প নিশীথিনী পড়া শুরু করে দিয়েছি। এই নিশীথিনী গল্পটা দেবি গল্প থেকে আরও সুন্দর। দুটো গল্পের মধ্যে সম্পর্ক থাকায় মনে হচ্ছে দেবির শেষ অংশ পড়ছি। এজন্য গল্পটা না পড়ে উঠা ছিল অসম্ভব। তাই নিশীথিনী গল্পটাও ছাড়তে পারলাম না। আবার পড়তে শুরু করলাম। নিশীথিনী গল্পটা যখন শেষ করলাম তখন রাত সাড়ে নটা বাজে। কাহিনী এখানেই শেষ নয়। শুরু

হলো চিন্তা, আর তা গল্পগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে। দুটো গল্পতেই অতিপ্রাকৃত বিষয় বিশেষ করে ইএসপি (Extra Sensory Power) এর উপস্থিতি এবং ব্যবহার ছিল অবাক করার মতো। হুমায়ূন আহমেদ মিসির আলীর মাধ্যমে চমৎকার ব্যাখা দিয়েছেন অতিপ্রাকৃত শক্তির। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটা দেননি। নীলু নামের এক চরিত্রের ইএসপি ক্ষমতার ব্যাখ্যা উহ্য রেখেছিলেন। এজন্য মিসির আলী Supernatural হিসেবে ক্ষমতাটা মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ ব্যাখ্যাটা মানুষের বর্তমান ক্ষমতার উর্ধ্বে। কিন্তু আমি যেন কেন মানতে পারছিলাম না। আমি ভাবতে শুরু করলাম এবং একসময় ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে দেখি সকাল হয়ে গেছে। নিজের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি ইউনিফর্ম পরে ঘুমিয়ে আছি। অর্থাৎ গতকাল আফিসে আমি যে ইউনিফর্ম পরে গিয়েছিলাম সেই ইউনিফর্ম আর খোলা হয়নি। আর আমার লেখার টান যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে আমি নিজেও বলতে পারব না। আমি তখন মিসির আলির ইএসপি ক্ষমতার ব্যাখ্য খোঁজার পরিবর্তে হুমায়ূন আহমেদের অন্য মানুষকে লেখা দিয়ে সম্মোহিত করার ক্ষমতার রহস্য নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। অন্যদের সম্মোহিত করার এই ক্ষমতার নাম দিলাম ইএইচপি (Extra Hypnotizing Power). পৃথিবীতে ইএসপি (ESP) ক্ষমতার অধিকারী মানুষের সংখ্যা যেমন খুব কম, ইএইচপি (EHP) ক্ষমতার অধিকারী মানুষের সংখ্যা আরও কম। এরকম কম সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর দক্ষ উপস্থাপনা এবং লেখনীতে মানুষকে সম্মোহিত করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এতটাই অসাধারণ যে তিনি তার দেবি এবং নিশীথিনী গল্প দিয়ে আমাকে সারারাত ইউনিফর্ম পরিয়ে রেখেছিলেন, আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন আমার নিজের গল্প লেখার টানের ভিতর থেকে তাঁর গল্প লেখার রহস্যে, ভাবতে বাধ্য করেছিলেন নীলুর ইএসপি ক্ষমতার রহস্য নিয়ে। হয়তো এ কারণেই হুমায়ূন আহমেদ আমার কাছে শুধু এক অসাধারণ লেখকই নন, তিঁনি এক বিস্ময়, মহাবিস্ময়।

৮

হুমায়ূন আহমেদের লেখা কেন ভালো লাগে - এর সম্পূর্ণ উত্তর আমি কখনও দিতে পারব না। হতে পারে তিনি আমাদের চারপাশের সাধারণকিছুকে খুব অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাঁর লেখা এত সহজ, এত সরল যে লেখার মধ্যে জটিলতা চিন্তা করা যায় না। তিনি যেমন সহজ বিষয়কে অনেক সহজভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, তেমনি অনেক জটিল বিষয়কে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। তার এই ক্ষমতার কারণে তার অনেক সামালোচকও তার ভক্ত হয়ে যান। লেখক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের এটা ছিল অদ্বিতীয় ক্ষমতা। আমার জীবনের আর একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করছি।

কিছু মানুষ আছেন যারা হুমায়ূন আহমেদের লেখার বিরোধীতা করেন। এটা খুবই স্বাভাবিক, হুমায়ূন আহমেদের লেখার সমালোচক থাকবেই। এই সামালোচকদের অনেকে বলে থাকেন হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই, সবকিছু শুধুই ফিকশন বা কল্পনা, ভিতরে শিক্ষণীয় কিছুও নেই। কাজেই হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ার কোনো অর্থ হয় না। ব্যক্তি আমি এর ঘোর বিরোধিতা করি। তবে আমি এ বিষয়ে এখন তর্কে যাব না। কারণ গত বিশ বছরে এ নিয়ে আশেপাশের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অনেক তর্ক বিতর্ক, উচ্চ্য বাচ্য করেছি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে হুমায়ূন আহমেদের লেখা অসাধারণ, অন্তত আমার কাছে।

২০০৬-২০০৭ সালের দিকে আমি যখন বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে কর্মরত তখন আমার এক সহকর্মী যে কিনা হুমায়ূন আহমেদের কড়া সামালোচক, আমাকে বিখ্যাত এক লেখকের বই দিয়ে বলল, তুমি এই বইটা পড়লে বুঝতে পারবে হুমায়ূন আহমেদ কতটা হালকা লেখক। কথাটা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি শর্ত দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে আমি তোমাকে হুমায়ূন আহামেদের একটা বই দেব এবং সেটা তোমাকে পড়তে হবে। সে রাজি হলো। তখন আমার কাছে হুমায়ূন আহমেদের 'মীরার গ্রামের বাড়ি' বইটি ছিল। সেই বইটিই আমি তাকে দিলাম।

আমাকে যে বইটি পড়তে দেয়া হয়েছিল সেটা ছিল সমরেশ মজুমদারের 'গর্ভধারীনি'। বিশাল মোটা বই। নিঃসন্দেহে বইটি অসাধারণ। কারণ পাঁচশ পৃষ্ঠার ঐ বইটি আমি ভার্সিটিতে পড়াকালীন আমার ক্লাসমেট সাইফুলের কাছ থেকে ধার করেছিলাম। তারপর মাত্র তিনদিনে শেষ করেছিলাম।

কিন্তু আমি আমার সহকর্মীকে সেটা বললাম না। বইটি হাতে নিয়ে এমন ভাব করতে লাগলাম যেন বইটি আমার কাছে নতুন।

সময়টা ছিল সন্ধ্যার পর। আমরা দুজন অফিসার্স মেসে দুরুমে থাকতাম। আমি দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি আমার সহকর্মী 'মীরার গ্রামের বাড়ি' পড়তে শুরু করেছে। যেহেতু 'মীরার গ্রামের বাড়ি' বইটি আমি আগে পড়েছি অনুমান করতে পারছিলাম ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে পড়তে।

রাতে দুজন ডাইনিং এ খেতে বসলে সহকর্মী বলল, 'গর্ভধারীনি' কেমন লাগছে?

বললাম, ভালো তবে বেশি মোটা বই।

এরপর আমি পাল্টা প্রশ্ন করে বললাম,'মীরার গ্রামের বাড়ি' তোমার কেমন লাগছে?

শেষ না করে বলা যাবে না। আসলে হুমায়ূন আহমেদ লিখে ভালো, তবে ফিনিশিংটা দিতে পারেন না। একেবারে গুলিয়ে ফেলেন।

আমি একটু অন্যভাবে বললাম, এই বইটা আসলে অতটা ভালো না, আমার উচিত ছিল একাডেমির লাইব্রেরি থেকে তোমাকে ভালো একটা বই এনে দেয়া।

সহকর্মী তাড়াতাড়ি বলল, না না, দরকার নেই। এটা ভালো লাগছে। আগে শেষ করি।

আমি বুঝতে পারছিলাম আমার সহকর্মী বইটির গভীরে ডুবে আছে। তার খাওয়ার মধ্যে কেমন যেন তাড়া। হুমায়ূন আহমেদের বই পড়লে এরকমই হয়। একমাত্র বই ছাড়া অন্যান্য কাজে তাড়াহুড়া চলে আসি। এটা হুমায়ূন আহমেদের আর একটা গুন। কীভাবে যেন তিনি পাঠককে তার বইয়ের মধ্যে আকৃষ্ট করে রাখেন। এজন্য আমি মনে করি হুমায়ূন আহমেদের বই ছোট ছোট হওয়াই সঠিক ছিল। তা না হলে তার ভক্তরা অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে সারাদিন তার বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকত।

খাওয়ার আধঘণ্টা পর আমি আমার সহকর্মীর রুমে গেলাম। সে শুয়ে শুয়ে বইটি পড়ছিল। আমি প্রবেশ করতে সে আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল। আমি তার পাশে বসে দেখলাম বইয়ের আর মাত্র দশ বারো পৃষ্ঠা বাকি। তারপর বইটি শেষ হয়ে যাবে। আমি তখন হঠাৎই টান দিয়ে বইটি নিয়ে নিলাম। আমার সহকর্মী শোয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠে বলল, এ্যাই, কি করছ তুমি? বই নিলে কেন?

আমি খানিকটা অপরাধীর ভঙ্গিতে বললাম, আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

কি কথা?

তোমার এই 'গর্ভধারিণী' বইটি এত মোটা যে পড়তে পারব না। বইটি পড়তে গিয়ে দেখি খুবই ভালো বই। কিন্তু আমার ধৈর্য হবে না। আমি বইটি শেষ করতে পারব না।

সহকর্মী সাথে সাথে বলল, তোমরা যারা হুমায়ূন পড়ো, তাদের এই এক মহা সমস্যা। ধৈর্য থাকে না। হুমায়ূন আহমেদ মানুষের সব ধৈর্য নষ্ট করে দিয়েছেন।

তা তুমি যা বলো অসুবিধা নেই। এই যে নাও তোমার বই, আর আমরটা আমি নিয়ে গেলাম।

এই কথা বলে 'গর্ভধারীনি' সহকর্মীর বিছানায় রেখে আমি 'মীরার গ্রামের বাড়ি' হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সহকর্মী সাথে সাথে খাট থেকে নেমে এসে বলল, তুমি ঐ বইটা নিচ্ছ কেন? আমার মাত্র কয়েক পাতা বাকি, আমি শেষ করি।

আমি রুম থেকে বের হতে হতে বললাম, তোমার শেষ করার দরকার নেই। তোমার ধৈর্য কমে যাবে।

কমলে কমবে, অসুবিধা নেই। আগে মীরার কি হলো সেটা জানি..

আমি আর তার কথায় কান দিলাম না। বইটা আমার রুমে টেবিলের উপর রেখে ভালো একটা জামা পড়তে শুরু করলাম। সে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

বাইরের গেটে। এসপি এডমিন স্যার ফোন করেছিলেন। বললেন দ্যাখো তো গেটের সবাই ঠিক মতো কাজ করছে কিনা? তুমি যাবে?

না না, যাব না। তাড়াতাড়ি বলল সহকর্মী।

আমি বাইরে বের হয়ে এলাম। আমার সহকর্মী আমার রুমেই দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক এক মিনিট পর আমি আবার আমার রুমে ফিরে এলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, আমার রুমে টেবিলের উপর 'মীরার গ্রামের বাড়ি' বইটি নেই। আমার সহকর্মীর রুমে উঁকি দিয়ে দেখি সত্যি সে 'মীরার গ্রামের বাড়ি' বইটি আবার পড়তে শুরু করেছে। আমি বুঝলাম আমি জিতে গেছি। আসলে বাইরের গেটে যাওয়ার জন্য আমি এসপি এডমিন স্যারের কোনো ফোন পাইনি। সম্পূর্ণটাই ছিল বানানো।

আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, ’হুমায়ূন আহমেদ আমার ঐ সহকর্মীকে কতোটা সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন?’ নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, হানড্রেড পার্সেন্ট।

এরপর আমি অফিসার্স মেসের বারান্দায় গিয়ে বসি। ওয়েটার দুলালকে বলি দুধ দিয়ে চমৎকার এক কাপ চা দিতে। সে চা নিয়ে আসে। চা মুখে দিতে আকাশের দিকে নজর পড়ে। চমৎকার পূর্ণিমার চাঁদ। সেদিন কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল, হুমায়ূন আহমেদও পূর্ণিমার চাঁদ দেখছিলেন, কারণ পূর্ণিমা সবসময়ই তার খুব প্রিয় ছিল।

অবশ্য এখানে একটা কথা বলতেই হয়, আমার ঐ সহকর্মী ’মীরার গ্রামের বাড়ি’ পড়া শেষে হুমায়ূন আহমেদের ভক্ত হয়নি। বরং বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। আমি তখন মিটি মিটি হেসে বলেছিলাম, হুমায়ূনের অনেক সমালোচক হুমায়ূন আহমেদের অহেতুক সমালোচনা করলেও তারা ঠিকই হুমায়ূন আহমেদের বই পড়তে পছন্দ করেন - একজন লেখক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর স্বীকৃতি কি হতে পারে! এজন্যই হুমায়ূন আহমেদ আমার কাছে Always The Great!

০৯

সম্ভবত ২০০5 সাল থেকে আমি নিয়মিত হুমায়ূন আহমেদের বই কিনতে শুরু করি। মেলায় গেলে হুমায়ূন আহমেদের নতুন প্রকাশিত বইয়ের সাথে সমগ্র কেনার প্রতি আমার আগ্রহ বেশি থাকত। বইগুলো বাসায় আনার সাথে সাথে যে যার মতো নতুন বইগুলোর উপর ঝাপিয়ে পড়ত। সমগ্রগুলোর দিকে অবশ্য সবাই অতটা মনোযোগ দিত না। মাঝে মাঝে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের সাথে আমার নতুন প্রকাশিত বইগুলোও একসাথে আনতাম। মজার ব্যাপার ছিল, আমার বইগুলো সবাই নেড়ে চেড়ে দেখে শেষে হুমায়ূন আহমেদের বই পড়া শুরু করত। ব্যাপারটা আমার মধ্যে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করত। মাঝে মাঝে আরও অবাক করা কান্ড ঘটত। আমি লক্ষ্য করতাম আমি নিজে আমার বইগুলো ভালোভাবে দেখার পরিবর্তে হুমায়ূন আহমেদের বই পড়তে শুরু করেছি। নিজের নতুন বই সব লেখকেরই নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের টানের কাছে আমি পরাজিত হতাম। আমার বই রেখে হুমায়ূন আহমেদের বই পড়া শুরু করতাম।

আমাদের বাসায় আমার আব্বা, আম্মা, স্ত্রী পলিন, ছোট দুই ভাই বাবু আর পারভেজ থাকে। হুমায়ূন আহমেদের বই কিনলে পারভেজই বেশি আগ্রহ দেখায় এবং সে পড়তে শুরু করে। বাবুর অবশ্য হুমায়ূন আহমেদের প্রতি অতটা আগ্রহ নেই। তার ধারণা হুমায়ূন আহমেদের বই আর মজার নেই, আগের বই ভালো ছিল, নতুন বইগুলো একই রকম। এজন্য কয়েক বছর ধরে সে হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ে না। আমি ওকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করি হুমায়ূন আহমেদের এখনকার বইগুলোও অনেক অনেক ভালো এবং সমৃদ্ধ, সে তা মানতে চায় না।

কয়েক বছর আগে হুমায়ূন আহমেদের ’বাদশা নামদার’ বইটি যখন বের হলো প্রথমেই বইটি আমি কিনে ফেললাম। তারপর যথারীতি বাসায় এসে বইটি পড়েও ফেললাম। ’বাদশা নামদার’ বইটি বাদশা হুমায়ূনকে নিয়ে লেখা। ব্যক্তি আমি ইতিহাসে সবসময়ই দুর্বল। বিশেষ করে ছোটবেলায় বাবর, হুমায়ূন, আওরঙ্গজেবসহ তৎকালীন নবাব আর পরবর্তীতে সিরাজউদ্দোলার কাহিনী পড়তে ভালো লাগলেও খুব কষ্ট হতো। কিছুতেই কে কার ছেলে, কে কার পিতা, কে কোন আমলের সম্রাট, সুলতান কিংবা বাদশা ছিল কিছুই যথাযথভাবে মনে রাখতে পারতাম না। আর কোন সালে কে ক্ষমতায় ছিল তা মনে রাখা ছিল আরও দুঃসাধ্য। কিন্তু ’বাদশা নামদার’ বইটিতে হুমায়ূনের শাসনকালসহ জীবনী এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে আমি নিজে বিস্মিত হয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে ’বাদশা নামদার’ হুমায়ূন আহমেদের একটা অসাধারণ বই। বইটি পড়ার পর আমি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, বাবুকে বইটি পড়তে দিলাম। ও প্রথমে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। আমি বেশ কয়েকবার বলার পর ও পড়তে শুরু করল এবং একসময় গভীরভাবে হারিয়ে গেল হুমায়ূনের রাজত্বকালের সেই ঐতিহ্য, জৌলুস, বিভীষিকাময় যুদ্ধ এবং শেষ পরিণতির অজানা কাহিনীর মধ্যে। বইটি পড়া শেষ হলে বাবু, যে কিনা হুমায়ূন আহমেদের বই পড়া ছেড়ে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত আমার মতো স্বীকার করতে বাধ্য হলো ’বাদশা নামদার’ অসাধারণ একটি বই। ঐ বইটি পড়ার পর বাবু হুমায়ূন আহমেদেরে প্রতি আর বিরাগভাজন নেই।

আমি অনুভব করি মানুষের মনকে বোঝার (Read) অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল হুমায়ূন আহমেদের। তিনি জানতেন কীভাবে মানুষকে সম্মোহিত করতে হয়, মানুষকে কাঁদাতে হয়, মানুষকে হাসাতে হয়

আবার মানুষকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দিতে হয়। হুমায়ূন আহমেদের হিমুর কোনো একটা গল্পের একটা ঘটনায় এখনও আমি হাসি। ঘটনাটা ছিল এরকম,

হিমু তখন মেসে থাকে। হিমুর ফুফু হিমুকে ডাকতে তার ম্যানেজারকে সকালে হিমুর কাছে পাঠিয়েছে। স্যুট টাই পরা ম্যানেজার এসে দেখে হিমু মেসের ভগ্নপ্রায় একটা ঘরে ঘুমাচ্ছে। সে হিমুকে ডেকে তোলায় হিমু খুব বিরক্ত হয়। হিমু জানতে চায় কেন এসেছে।

ম্যানেজার বলল, তাকে তার ফুফু তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন।

হিমু বিরক্ত হয়ে বলল, তাড়াতাড়ি যেতে পারব না। দেরি হবে।

এই কথা বলে হিমু কাথা মুড়ি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ম্যানেজার আবার বলল, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তার ফুফু জরুরী প্রয়োজনে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হিমু কাথা সরিয়ে সরু চোখে তাকায়। তারপর বলল, যেতে পারি একটা শর্তে।

ম্যানেজার জানতে চেয়ে বলে, কি শর্ত?

হিমু এবার ইঙ্গিত করে বাইরে একটা টয়লেট দেখায়। সেই টয়লেটের সামনে লুঙ্গি পরা মেসের চারপাঁচজন সদস্য বদনা হাতে একজনের পিছনে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে টয়লেটেরে ভিতরে আরও একজন কাজ সারছে। হিমু ম্যানেজারকে উদ্দেশ করে বলে, ম্যানেজার সাহেব, আমার ঘরের কোনায় যে বদনাটা আছে আপনি এখন ঐ বদনা হাতে ঐ লাইনে গিয়ে দাঁড়াবেন। যখন আমার সিরিয়াল আসবে তখন আমি আমার তলপেটের কাজ সারব। তারপর হাত মুখ ধূয়ে নাস্তা করে ফুফুর বাসায় যাব। যত তাড়াতাড়ি তলপেটের কাজ সারতে পারব তত তাড়াতাড়ি যেতে পারব, বুঝতে পেরেছেন?

স্যুট টাই পরা ম্যানেজার তখন একবার হিমুর দিকে আর একবার টয়লেটের লম্বা লাইনের দিকে তাকাচ্ছিল। তারপরের ঘটনা কি ঘটেছিল মনে নেই।

মূল উপন্যাস পড়ার সময় উপরের ঐ অংশটুকু পড়ে আমি এত হেসেছিলাম যে ঘটনাটা আমার মনে একেবারে গেঁথে গেছে। আমি জানি না অন্য কারো জন্য ঘটনাটা হাসির হবে কিনা। তবে আমার জন্য হাসির হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদেরে বইয়ের ঐ রকম অনেক ঘটনা আমাকে অনেক হাসিয়েছে। আমার দুঃখের সময় হসিয়েছে, আমার যন্ত্রণার সময় হাসিয়েছে, আমার কষ্টের সময় হাসিয়েছে। একজন মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা দূর করে তার মুখে হাসি ফোটানোর কৃতিত্ব অবশ্যই অনেক অনেক বড় কৃতিত্ব। হুমায়ূন আহমেদের এই কৃতত্ব আর গুণের প্রতি আমি সত্যি সবসময় শ্রদ্ধাশীল।

আগেই উল্লেখ করেছি মানুষকে ঘোরের মধ্যে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল হুমায়ূন আহমেদের। হুমায়ূন আহমেদের কোনো একটা বই পড়ে এমন একটা ঘোরের মধ্যে আমিও পড়েছিলাম। বইটির নাম মনে নেই। বইটিতে শিক্ষক তার ছাত্র কিংবা বাবা তার ছেলেকে (যদি আমার ভুল না হয়) একটা ধাঁধা ধরেছিল। ধাঁধাটি ছিল এরকম,

বড় একটা সাপ হঠাৎ তার লেজ গিলতে শুরু করল। সময় যত যাচ্ছে সাপটা ততই নিজের লেজ গিলছে। অবশেষে কি হবে?

ধাঁধাঁটি খুব সাধারণ। কিন্তু উত্তরটা সাধারন না, সত্যি কঠিন। সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে আমি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করি। উত্তরও আসতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন। একসময় মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। প্রশ্নটাকে বোঝা মনে হতে থাকে। এরকম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। আমি তখন তাই করতে থাকি। যাকে পাচ্ছিলাম তাকেই ধাঁধাটি ধরছিলাম। যারা একটু বেশি চিন্তা করেছিল তাদের অবস্থা আমার মতো হয়েছিল। আর যারা চালাক ছিল, তারা দ্রুত ধাঁধাটিকে ভুলে গিয়েছিল। তবে আমি কেন যেন ভুলতে পারিনি। এখনও

আমি অনেককে এই ধাঁধাঁটি ধরি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ধরি? উত্তর একটাই, হুমায়ূন আহমেদ তার ঐ ধাঁধাঁ দিয়ে আমাকে এমন ঘোরের মধ্যে ফেলেছেন যে এখনও আমি সেই ঘোরের মধ্যেই আছি বলে মনে হয়। জানি না ধাঁধাটা কতদিন আমার মধ্যে থাকবে আর হুমায়ূন আহমেদ কতবার আমার সম্মানীয়, শ্রদ্ধেয় হবেন।

লজিক আর অ্যান্টি লজিকের খেলায় হুমায়ূন আহমেদ এক কথায় আমার কাছে অতুলনীয়। মিসির আলী যেমন লজিক বা যুক্তির মধ্যে সবকিছু ব্যাখ্যা করেন, হিমুর সবকিছু চলে লজিক বা যুক্তির বাইরে দিয়ে। অথচ বিপরীতধর্মী দুটো চরিত্রই পাঠকদের কাছে অবিশ্বাস্য রকম জনপ্রিয়। হিমুর জনপ্রিয়তা নিয়ে অনেক অনেক গল্প আছে। যুবক সমাজের অনেকেই হলুদ পাঞ্জাবি পরে হিমু হয়েছেন। শুনেছি হিমুরা একসাথে মিছিল করেছে, বই মেলায় এসেছে, হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিনেও এসেছে। কেউ কেউ নাকি হিমু হয়ে বিয়েও করেছে। হিমুদের এরকম কর্মকান্ড দেখার সুযোগ একবার আমার হয়েছিল। সম্ভবত ২০০৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা। আমি রাতে জাতীয় শহীদ মিনারে ডিউটি করছি। রাত বারোটা এক মিনিটে মাহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং তারপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুস্পস্তবক অর্পন করেন। তারপরই শুরু হয় মানুষের ঢল। তিনটা পর্যন্ত মানুষের প্রচন্ড চাপ থাকে। আমার ডিউটি ছিল জগন্নাথ হলের গেটের সামনের রাস্তায় যেখান দিয়ে মানুষ ভিতরে প্রবেশ করে। রাত তিনটার পর যখন মানুষের ঢল অনেকটা কমল তখন এনেক্স ভবনের ভিতরে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে চা খেতে এসেছিলাম। খুব ক্লান্তি লাগছিল দেখে আমি হাতে চায়ের কাপ নিয়ে কন্ট্রোল রুমের পিছনে হাঁটছিলাম। ঐ জায়গাটা ছিল সংরক্ষিত, অর্থাৎ সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম কন্ট্রোল রুমের পিছনে সতের আঠার বছরের চশমা পরা একটি ছেলে একটা পাঞ্জাবী পাল্টে আর একটা পাঞ্জাবি পরছে। সংরক্ষিত এলাকায় এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত আপত্তিকর এবং সন্দেহজনক। জায়গাটা ছিল আধো অন্ধকার। সাথে সাথে আমি পাশের দুজন কনস্টবলকে তাড়াতাড়ি যুবকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসতে বললাম। ততক্ষণে ছেলেটি নতুন পাঞ্জাবি পরে ফেলেছে। আমার সামনে এসে ছেলেটি ভয়ে কাঁপছিল। আমি তাকে বললাম, এখানে কি করছ?

স্যার হলুদ পাঞ্জাবি পরছি।

কেন?

স্যার হিমু হয়ে শহীদ মিনারে ফুল দেব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, মানে!

জি স্যার। আমি নিজে ফুল দিয়ে এসেছি। সবাই শহীদ মিনারে ফুল দেবে, হিমু দেবে না তা কি হয়? তাই আমি হলুদ পাঞ্জাবি পরে এসেছি। হিমু হয়ে ফুল দেব।

এতক্ষণ ছেলেটি অন্ধকারে থাকায় পাঞ্জাবীর রঙ দেখতে পাইনি, এবার দেখলাম। সত্যি হলুদ রঙের পাঞ্জাবি যেরকম হিমু পরে।

এর মধ্যে পুলিশ কনস্টবলের একজন তার সমস্ত শরীর সার্চ শেষে বলল, স্যার সাথে একটা ফুলের তোড়া ছাড়া আর কিছু নেই। যেখানে পোশাক পাল্টাচ্ছিল সেখানে আগের পাঞ্জাবিটা পাওয়া গেছে।

খুব কাছে আসায় ছেলেটির মুখ আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ছেলেটি এমনিতেই ফর্সা, ভয়ে মুখটা রক্তশূন্য হওয়ায় আর ফর্সা লাগছিল।

আমি বললাম, হিমু তো চশমা পরে না। তুমি চশমা পরেছ কেন?

সাথে সাথে ছেলেটি চশমা খুলে ফেলল। তারপর পায়ের দিকে দেখিয়ে বলল, স্যার, হিমু স্যান্ডেলও পরে না, এই যে দ্যাখেন আমার পায়ে স্যান্ডেল নেই। হিমুর পাঞ্জাবীতে পকেট থাকে না, এই যে দ্যাখেন স্যার আমার পাঞ্জাবিতে পকেটও নেই।

আমি ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম ছেলেটির কোনো খারাপ মতলব ছিল না। কারণ সে ছিল মাইওপিক রুগী। তার চোখের পাওয়ার ছিল অনেক বেশি। মাইনাস সাত আট হবে। আমি গত পঁচিশ বছর ধরে চশমা ব্যবহার কারণে চশমার গ্লাস দেখলে বুঝতে পারি কোন চশমায় কত পাওয়ার। সন্ত্রাসী কারো চোখে কখনও হাই পাওয়ারের চশমা থাকে না (ইদানিং কালের হ্যাকার বা সাইবার ক্রিমিনাল ব্যতীত)। কজেই ছেলেটি যে ভয়ংকর কেউ না, বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার।

ছেলেটির নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে সে দ্রুত নাম ঠিকানা বলল। নামটা আমার মনে নেই, তবে সে যে মীরপুর থেকে এসেছিল সেটা আমার মনে আছে। তাকে আরও কিছু প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম সংরক্ষিত এলাকায় সে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল। সবার সামনে পাঞ্জাবী পাল্টানো যাবে না বলেই সে ঐ অন্ধকারে এসেছিল।

আমি তখন ছেলেটিকে সাথে নিয়ে শর্টকার্ট পথে শহীদ মিনারের বেদির কাছে মানুষের ঢল পর্যন্ত পৌঁছে দেই। ছেলেটি ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে শেষ বারের মতো আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল কোনো ছেলে আমার দিকে তাকায়নি, তাকিয়েছে হিমু। আমার তখন খুব ইচ্ছে হচ্ছিল হুমায়ূন আহমেদ এই হিমুকে একটু দেখুক। তার সৃষ্ট হিমু জাতীয় শহীদ মিনারে ফুল দিচ্ছে - নিশ্চয় এই দৃশ্য তার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরাতো।

১০

ঘটনাটা সম্ভবত ২০১০ সালের বইমেলার। এরপর ২০১১ এবং ২০১২ সালের বইমেলা পার হয়ে যাওয়ায় আমি সালটা সঠিকভাবে মনে করতে পারছি না। তবে যতদূর মনে পড়ে সময়টা ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসই হবে। ঐ বছর বইমেলার যে দিনটির কথা আমি বলতে চাচ্ছি সেই দিনটি কি বার ছিল আমার সঠিকভাবে মনে নেই। সম্ভবত শুক্র কিংবা শনিবার। কারণ ঐ দিন আমি সিভিলে ছিলাম (ইউনিফর্ম পরা ছিলাম না)। সঠিক সময়টাও আমার খেয়াল নেই, দুপরের আগে কিংবা ঠিক পরে হবে। ২০১০ সালের শুরু থেকে আমি ওয়ারি ডিভিশনের এডিসির দায়িত্বে ছিলাম। তখন ব্যস্ততার কারণে বইমেলায় আসার সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়ত। এজন্য সুযোগ পেলেই চলে আসতাম। ঐ সময় মেলার অধিকাংশ পুলিশ সদস্য আমাকে চিনত। এর কারণ ২০০৯ সালে আমি রমনা ডিভিশনের এডিসির পদে দায়িত্বরত ছিলাম। এজন্য মেলায় গেলে পরিচিত কারো না কারো সাথে দেখা হয়ে যেত এবং সে আমার সাথে হাঁটতে শুরু করত। অনেককে নিষেধ করলেও শুনত না। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হতো না বিধায় আমি মেলার মধ্যে অধিকাংশ সময় ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ সদস্যদের এড়িয়ে চলতাম এবং অফিসিয়াল ডিউটি ছাড়া ইউনিফর্ম পরে যেতাম না।

ঐ দিন আমি বইমেলায় হাঁটছিলাম আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম। বইমেলায় প্রবেশ করলে আমি প্রথম কিছুক্ষণ হাঁটি, তারপর কোথাও গিয়ে বসি। বইমেলায় একা একা হাঁটতে আমার খুব ভালো লাগে। সবাই বই দেখে আর আমি দেখি বই কেনা মানুষগুলোকে। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের। বই কিনে তারা কত আনন্দিত! আর যারা জাফর ইকবাল স্যারের বই কিনে তাদের আনন্দ আরও বেশি। জাফর ইকবাল স্যার যখন অটোগ্রাফ দেন তখন আমি প্রায়ই তার পাশে শিশু কিশোরদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। স্যারের একটা অটোগ্রাফ একটা শিশুকে কতটা খুঁশি করে তা না দেখলে বোঝা যাবে না।

আমি হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকের মূল গলিতে ঢুকে গেলাম। এই গলির শেষ মাথায় অন্য প্রকাশের স্টল। গত কয়েক বছর ধরে হুমায়ূন আহমেদের প্রায় সব বই অন্য প্রকাশ থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে। অন্য প্রকাশের সামনে সবসময় ভীড় থাকে। ঐ দিন আমার কাছে মনে হচ্ছিল ভীড় একটু যেন বেশিই। আমি আরও কাছে যেতে বুঝলাম ভীড় না, লম্বা লাইন। তবে লাইনটা একপাশে, সম্পূর্ণ স্টলের সামনে না। কেন এমন লাইন আমার খুব জানতে ইচ্ছে হলো। কাছে গিয়ে লাইনের পিছনের লোককে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল, ভিতরে হুমায়ূন আহমেদ আছেন। তিনি সবাইকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন।

কথাটা শোনমাত্র আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। মনে পড়ল হুমায়ূন আহমেদকে দেখার জন্য কত চেষ্টাই না করেছি। খুলনার সার্কিট হাউস মাঠে গিয়েছি, হুমায়ূন আহমেদের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছি, মোকাররম ভবনে গিয়েছি, একটা অটোগ্রাফের জন্য মেলার মধ্যে সারাদিন হেঁটে বেড়িয়েছি। অথচ কখনোই আমি হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা করতে পারিনি। সেই হুমায়ূন আহমেদ কিনা এখন ঠিক আমার সামনে! মাত্র বিশ পঁচিশ গজ দূরে! ভাবতেই আমার শরীরে ভালোলাগার শিহরণ বয়ে গেল।

ঐ মুহূর্তে আমি যে কি করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সামনে স্টলের দিকে তাকালাম। যেখানে হুমায়ূন আহমেদ বসে আছেন সেখানে খুব ভীড়। এত দূর থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

মানুষের ভীড় ঠোকানো এবং লাইন ঠিক করে দেয়ার জন্য দুপাশে পুলিশও আছে। পুলিশ দেখে আমি কিছুটা দমে গেলাম, আমাকে আবার চিনে না ফেলে।

ঠিক করলাম, যাই হোক না কেন আমি আজ হুমায়ূন আহমেদের একটা বই কিনে সেটাতে অটোগ্রাফ নেব। এজন্য লাইনে দাঁড়ালাম। আমার অবস্থান সবার পিছনে। লাইন এক ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনের দিকে এগোচ্ছে। সম্ভবত হুমায়ূন আহমেদ অটোগ্রাফ দিচ্ছেন এবং পাঠকদের সাথে কথা বলছেন। সকল লেখকই এটা করে থাকেন। এতে পাঠক যেমন খুশি হন, লেখকও আনন্দ পান।

হুমায়ূন আহমেদের সামনে গিয়ে আমি যে বইটা পাব সেটাই কিনব ঠিক করলাম। তবে লক্ষ্য করলাম যারা লাইনে দাঁড়িয়েছে সবার হাতেই হুমায়ূন আহমেদের বই। অর্থাৎ সবাই বই কিনে ফেলেছে। বই কিনে লাইনে দাঁড়াতে হয়। আমি ঐ বছরের হুমায়ূন আহমেদের সকল বই আগেই কিনে ফেলেছিলাম। আবার বই কিনতে যেতেও ইচ্ছে করছিল না। কারণ তাহলে আমাকে নতুনভাবে লাইনে দাঁড়াতে হবে, এতে অনেক সময় লাগবে। তাই লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। যদি প্রয়োজন হয় নিজের পরিচয় দিয়ে হলেও হুমায়ূন আহমেদের অটোগ্রাফ নেব - এটাই মনে মনে ঠিক করলাম। হুমায়ূন আহমেদ পুলিশ অফিসারদের প্রতি কিছুটা নমনীয় ভাব প্রকাশ করেন বলে জেনেছিলাম। কারণ তার বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার এবং ১৯৭১ সালে পিরোজপুরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ যে পুলিশ অফিসারদের পছন্দ করেন তার একটা ঘটনা আমি রমনা ডিভিশনের ডিসি আতিক স্যারের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আতিক স্যার রমনা ডিভিশনে বদলী হওয়ার আগে গাজীপুরের পুলিশ সুপার বা এসপি পদে দায়িত্বরত ছিলেন। ঐ সময় হুমায়ূন আহমেদ নুহাশ পল্লীতে বাইরের কোনো মানুষকে ভিতরে যাওয়ার খুব একটা অনুমতি দিতেন না। একদিন আতিক স্যার হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হুমায়ূন আহমেদ আতিক স্যারের সম্পূর্ণ পরিবারকেই দাওয়াত করেন। আতিক স্যার, ভাবী আর তার দুই মেয়েসহ নুহাশ পল্লীতে গেলে হুমায়ূন আহমেদ নিজে তাদের আপ্যায়ন করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বাবার স্মৃতিচারণ করে আতিক স্যারকে 'জোছনা ও জননী' বইটি অটোগ্রাফসহ উপহার দিয়েছিলেন। আমি রমনা ডিভিশিনের এডিসি থাকার সময় আতিক স্যার নিজে আমাকে ঘটনাটি বলেছিলেন। আতিক স্যারের ঐ ঘটনাটি আমাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

আমি যখন পাঁচ সাত গজ এগিয়েছে তখন হঠাৎই চার পাঁচজন উচ্ছৃঙ্খল ছেলে লাইন ভেঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল। সাথে সাথে শুরু হলো ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকার চেঁচামেচি। তখন দায়িত্বরত পুলিশ ছেলেদের ধাক্কা দিয়ে সরাতে চেষ্টা করতে ছেলেগুলো দ্রুত সামনে থেকে কেটে পড়ল। আর তাতে সামনে যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হলো তাতে মাত্র এক ঝলক আমি হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে পেলাম। মুহূর্তের জন্য যে হুমায়ূন আহমেদকে আমি দেখেছিলাম তার অবয়বটা খুব সাধারণ ছিল। তিনি অবাক চোখে সামনে তাকিয়ে আছেন, তার হাতে একটা কলম। তারপর আবার তিনি হারিয়ে গেলেন ভিড়ের আড়ালে। হুমায়ূন আহমেদকে ঐ এক ঝলক দেখে আমি সত্যি অভিভূত হয়েছিলাম। হুমায়ূন আহমেদকে ঐ এক ঝলক দেখার আনন্দ আমি কোনোদিনও কাউকে বোঝাতে পারব না। ঐ মুহূর্তটা ছিল আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। জানি না বাংলা ভাষায় এ ধরণের মুহূর্তকে ব্যক্ত করার জন্য কোনো শব্দ আছে কিনা। থাকলে সেটাই আমি ব্যবহার করতাম। ইংরেজিতে এরকম মুহূর্তকে ব্যক্ত করার জন্য কেউ কেউ Magic Moment শব্দটা ব্যবহার করেন। হয়তো ঐ মুহূর্তটা সত্যি আমার জীবনের Magic Moment ছিল।

এরপর আবার লাইন ঠিক করা হলো। আবার আমরা অটোগ্রাফের জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। এর মাঝে গন্ডগোলের কথা শুনে অনেক পুলিশ চলে এসেছে। এই পুলিশদের মধ্যে একজন সাব-ইন্সপেক্টর আমাকে চিনে ফেলল। সে আমাকে স্যালুট করে বলল, স্যার আপনি এখানে এই লাইনে কেন?

আমি খুব বিব্রত হলাম। নিচু গলায় বললাম, আমি অটোগ্রাফের জন্য এসেছি। আপনি এখন যান।

আপনি হুমায়ূন স্যারের অটোগ্রাফ নিবেন! আমরা থাকতে লাইনে দাঁড়াবেন কেন? আসুন স্যার আসুন। আমি আপনাকে অটোগ্রাফ নেয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আশে পাশের সবাই তখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। তাড়াতাড়ি বললাম, আপনি এখন আপনার কাজ করুন। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেই অটোগ্রাফ নেব।

সাব-ইন্সপেক্টর আরও জোর দিয়ে বলল, না স্যার, তা হয় না। আপনি আমাদের এই এলাকার এডিসি ছিলেন। আমরা থাকতে আপনি দাঁড়িয়ে অটোগ্রাফ নেবেন, তা কখনও হতে পারে না।

আমার তখন সত্যি রাগে গা জ্বলছিল। অনেক কষ্টে নিজের রাগটা নিয়ন্ত্রণ করলাম। সাব-ইন্সপেক্টর বেচারা যা করছে তা আমাকে ভালোবেসেই করছে। এসময় তাকে কড়া কথা শোনান মানে তাকে অপমান করা। বুঝতে পারলাম লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা আর নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলে শুধু আশেপাশের মানুষই না, আশেপাশের সকল পুলিশও আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

তাই আমি লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাইন থেকে বের হয়ে এলাম। শেষবার হুমায়ূন আহমেদকে দেখার জন্য একবার স্টলের দিকে তাকালাম। না, ভক্তের ভীড়ের কারনে হুমায়ূন আহমেদকে আর দেখা গেল না। আমি উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করলাম। সাব-ইন্সপেক্টর বুঝতে পেরেছিল আমি রাগ করেছি। অনেক কষ্টে তাকে বুঝলাম আমি রাগ করিনি। আরও বললাম পরে যখন অটোগ্রাফ নিতে আসব, অবশ্যই আগে তাকে জানিয়ে আসব।

মেলার বাইরে আসতে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, এক ঝলকের জন্য হলেও আমি হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে পেয়েছি। আজকের জন্য এই প্রাপ্তিটাও কম কিসের? আমি তো আশাই করিনি যে হুমায়ূন আহমেদকে আমি আজ দেখতে পাব। এই এক ঝলক হুমায়ূন আহমেদকে দেখা, জীবনে না দেখা হুমায়ূন আহমেদের থেকে নিশ্চয় অনেক...অনেক...অনেক বড় প্রাপ্তি!

১১

২০১২ সালের ১৮ জুলাই। আমি তখন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্টেলিজেন্স এন্ড এনালাইসিস ডিভিশনের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পদে কর্মরত। ঐ সময় আমি সত্যি খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলাম। কারণ দুই সপ্তাহের মধ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের জন্য সুদানের দার্ফুরে যেতে হবে। এজন্য অফিসের অসমাপ্ত কাজগুলো খুব দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু নানা ব্যস্ততার জন্য কাজগুলো শেষ হচ্ছিল না। দিন যত যাচ্ছিল ব্যস্ততা যেন তত বাড়ছিল। এজন্য সত্যি বেশ হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

ঐ দিন দুপুর আনুমানিক দুইটার দিকে অপারেশনস্ অফিসার সার্জেন্ট সাজ্জাদ শর্ট এডভান্স রিপোর্টটা (SAR) আমার টেবিলে উপস্থাপন করল। ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একটা বিশেষ দায়িত্ব হলো আগামীকাল কি ঘটবে বা ঘটতে পারে সে সম্পর্কে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারকে শর্ট এডভান্স রিপোর্টের মাধ্যমে অবহিত করা। এই রিপোর্টের নিচে আগামী সাত দিনে কি ঘটবে সে সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো উল্লেখ করা থাকে। এরকমই একটা তথ্যের উপর আমার চোখ আটকে গেল। সেখানে লেখা, 'বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের অবস্থা সংকটাপন্ন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।' লেখাটার পাশে কোনো মন্তব্য নেই।

হুমায়ূন আহমেদ যে অপারেশনের পর অসুস্থ হয়ে পূনরায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তা আমি জানতাম। তবে রিপোর্টটা কখনও শর্ট এডভান্স রিপোর্টটে আগে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। সংবাদটা দেখে আমি সার্জেন্ট সাজ্জাদকে বললাম, হুমায়ূন আহমেদের অসুস্থতার সংবাদটা এখানে অন্তর্ভূক্ত করেছেন যে?

সার্জেন্ট সাজ্জাদ বলল, স্যার সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে এবার হুমায়ূন আহমেদের শারীরিক অবস্থা সত্যি খুব খারাপ।

তাই নাকি?

জি স্যার। আমি খুব ভয়ে আছি।

কেন?

সত্যি যদি কিছু ঘটে যায়!

আমি সার্জেন্ট সাজ্জাদের চোখে তাকিয়ে বললাম, আশা করি কিছু ঘটবে না।

স্যার আপনি কীভাবে বলছেন?

হুমায়ূন আহমেদ অনেক উচু মানসিক শক্তির অধিকারী। যেহেতু তাঁর অপারেশন হয়ে গিয়েছে, বলতে পারেন বড় ধকলটা কেটে গেছে। ছোট-খাট অসুখ তাকে কাবু করতে পারবে না। আমি

নিশ্চিত তিনি আরও অনেকদিন বাঁচবেন। তার এই বেঁচে থাকাটা আমাদের সবার জন্য খুব প্রয়োজন।

কিন্তু স্যার..

কোনো কিন্তু নয়। আমি এই প্রতিবেদনে হুমায়ূন আহমেদের জীবন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

আমি কি তাহলে সংবাদটা বাদ দিয়ে দেব?

হ্যাঁ বাদ দিয়ে দিন। তবে আমাকে আপডেট জানাবেন।

কথাটা বলে আমি নিজেই লাল কালি দিয়ে সংবাদটা শর্ট এডভান্স রিপোর্ট থেকে কেটে দিলাম। কারণ কেন যেন আমি খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে হুমায়ূন আহমেদ সত্যি সুস্থ হয়ে আবার দেশে ফিরে আসবেন।

সার্জেন্ট সাজ্জাদ আমার রুম থেকে চলে যাওয়ার পর নালন্দা প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী জুয়েল ভাইয়ের ফোন পেলাম। কি একটা কাজে জুয়েল ভাই সেদিন ফোন করেছিলেন। কথার ফাঁকে জুয়েল ভাই বললেন, আমি জানতে পারলাম হুমায়ূন আহমেদের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ। এই সংবাদ পেয়ে জাফর ইকবাল স্যার বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা গিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

জানলেন কীভাবে?

বাংলাবাজারের সবাই বলাবলি করছে। এখন নাকি তাঁর অবস্থা সত্যি সংকটাপন্ন।

আমার মন বলছে তিঁনি এবারও সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তাহলে জাফর ইকবাল স্যারকে খবর দিয়ে নিয়ে যাবে কেন?

হয়তো কোনো কারণ আছে।

আমার সন্দেহ হচ্ছে।

আমরা এতকিছু চিন্তা করে এখান থেকে কিছু করতে পারব না। যা পারব তা হলো দোয়া করা। সবাই চলুন আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি যেন তিনি সুস্থ হয়ে দ্রুত দেশে ফিরে আসেন।

হ্যাঁ সেটাই ঠিক হবে।

এরপর জুয়েল ভাইয়ের সাথে আমার আর তেমন কোনো কথা হয়নি। অফিসের কাজে আবার মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কেন যেন পারছিলাম না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। শেষে না পেরে রুমের মধ্যে হাঁটতে শুরু করলাম। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন ছিল যেটা আমি পূরণ করতে পারিনি। আর তা হলো তার সাথে একবার দেখা করে কিছুক্ষণ কথা বলা। যদিও আমি সবাইকে বলছিলাম হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে যাবেন কিন্তু মনের মধ্যে একটা শংকা থেকেই যাচ্ছিল। সত্যি যদি অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটে যায় তাহলে বাংলা সাহিত্য যেমন তার সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারাবে তেমনি আমার মনের মধ্যেকার স্বপ্নটা আর পূরণ হবে না। সেক্ষেত্রে সেটা হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় এক অপূর্ণতা, অনেক বড় এক আফসোস - যার কষ্ট আমি কখনোই ভুলতে পারব না।

কিছুক্ষণ পর আবিদ ভাইয়ের ফোন পেলাম। আবিদ ভাই তখন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ট্রেনিং পদে কর্মরত ছিলেন। আবিদ ভাইয়ের উপর দায়িত্ব ছিল আমাদের মিশনে যাওয়ার টিকিটের দিন তারিখ ঠিক করা এবং টিকিট কেটে ফেলা।

ফোন ধরতে আবিদ ভাই বললেন, মিশনে যাওয়ার টিকিটের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে।

কবে?

পঁচিশে জুলাই।

আমি ভেবেছিলাম হয়তো জুলাই মাসের শেষে কিংবা আগস্ট মাসের প্রথমে হবে। তাই বললাম, এত তাড়াতাড়ি?

আমরা এর মধ্যে তিন মাস দেরি করে ফেলেছি। আর দেরি করা যাবে না। আর এ বিষয়ে তো তোমার সাথে দুদিন আগে কথা হয়েছে।

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম অন্তত দুই সপ্তাহ সময় পাব।

আর সম্ভব না। টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে। পাঁচিশে জুলাই সকালে ফ্লাইট, এমিরেটস্ এয়ারলাইনস্। দুবাই তিন ঘণ্টা ট্রানজিট শেষে সরাসরি খার্তুম। যা কিছু আছে গুছিয়ে ফেলো। দেখবে সময় খুব দ্রুত চলে গেছে।

আবিদ ভাইয়ের সাথে কথা শেষে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কি সেগুলোর একটা তালিকা করে ফেললাম। লম্বা তালিকায় একটা কাজ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর সেটা হলো নিখোঁজ মোস্তফা কামালকে খুঁজে বের করা। মোস্তফা কামাল আমার কেউ না, তাকে আমি চিনিও না। পূর্ব পরিচিত এক তরুন ব্যবসায়ী আসিফ সাহেবের মাধ্যমে সংবাদটা আমার কাছে আসে। সপ্তাহখানেক আগে আসিফ সাহেব আমাকে ফোন করে বলেন, ভাই, আপনি অনুমতি দিলে আপনার কাছে একটা বিষয় নিয়ে আসতাম। আমি তাকে আসতে বললে তিনি আমার কাছে এসে প্রথমেই বলেন, আমাকে একজন অপহৃত মানুষ উদ্ধার করে দিতে হবে।

আমি বললাম, ঘটনাটা বুলুন।

আসিফ সাহেব বললেন, যে অপহৃত হয়েছে তার নাম মোস্তফা কামাল। বাড়ি কুমিল্লায়। আগে লিবিয়ায় কাজ করত। কিন্তু লিবিয়ায় গাদ্দাফির পতনের পর অবস্থা খারাপ হওয়ায় সে দেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। তখন সে বাড়ি থেকে ঢাকা শহরে চাকুরির জন্য আসে। তারপর থেকে সে নিঁখোজ।

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, তারপর?

তার সাথে তার বাড়ির লোকজনের শেষ কথা হয় গত হয় জুন মাসের আঠার তারিখে। সে তখন বলেছিল সে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে রয়েছে। এরপর তার মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়। আর তার কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। উনিশে জুন তারিখে তার স্ত্রীর কাছে মালয়েশিয়া থেকে একটা ফোন আসে এবং জনৈক ব্যক্তি জানায় মোস্তফা কামাল জীবিত আছে এবং পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপন দেয়া হলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। মোস্তফা কামালের পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ। এমনিতেই গরীব মানুষ, তার উপর লিবিয়া গিয়ে অনেক টাকা লোকসান দিয়েছে। ঋণে জর্জরিত। এই পরিস্থিতিতে তাদের টাকা দেয়া সত্যি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। তারপরও স্বামীর কথা চিন্তা করে মোস্তাফা কামালের স্ত্রী আসামীর ফোনে আলোচনাপূর্বক নিজের বাবার বাড়ি এবং ভাসুরের কাছ থেকে টাকা ধার করে জুলাই মাসের এক তারিখে যাত্রাবাড়ির শনির আখড়া এলাকায় জাকির নামের এক ব্যক্তির নিকট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করে। ঐ টাকা প্রাপ্তির পর অপহরণকারীদের মোস্তফা কামালকে ছেড়ে দেয়ার কথা থাকলেও তারা দেয়নি। তারা এখন আরও এক লক্ষ টাকা দাবী করছে। এই টাকা দেয়ার মতো অবস্থা তাদের পরিবারের নেই। এখন সবার মরণাপন্ন অবস্থা।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই ধরনের কেসগুলো বেশ জটিল হয় এবং খুব সাবধানে এগোতে হয়। একটু ভুল হলেই আসামীরা ভিকটিমকে মেরে ফেলে। অনেকসময় মেরে ফেলার পরও মুক্তিন চাইতে থাকে। তাই নিশ্চিত হতে বললাম, মোস্তফা কামাল যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ কি?

তার স্ত্রীর সাথে এই মাসের এক তারিখের পরও কথা হয়েছে।

কি কথা হয়েছে?

আমি বিস্তারিত জানি না। তবে বলেছে তাকে যেন তারা বাঁচানোর চেষ্টা করে। যারা তাকে অপহরণ করেছে তারা খুব ভয়ংকর। পুলিশকে কিছু জানালে তাকে হত্যা করবে।

আসিফ সাহেবের তথ্যগুলো পরিপূর্ণ না থাকায় আমাদের একজন অফিসারকে সম্পূর্ণ তথ্য মোস্তফা কামালের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করতে বলি। অতঃপর ঘটনাটা যাত্রাবড়ি থানাকে জানানো হয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়তার সাথে করা হয়। আসামীদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে মোস্তফা কামালের অবস্থানও জানার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। মূল সমস্যা ছিল আসামী পক্ষের লোকজন কথা বলছিল মালয়েশিয়া থেকে। বোঝা যাচ্ছিল আসামীরা খুব পেশাদার এবং ভয়ংকর। তা না হলে তারা কখনোই মালয়েশিয়া থেকে ফোন করত না। ব্যাপারটা এরকম ছিল যে বাংলাদেশের অপহরণকারী যে মোস্তফা কামালকে অপহরণ করেছে সে প্রথমে মালয়েশিয়ায় তার পার্টনারের সাথে কথা বলত। ঐ পার্টনার মালয়েশিয়া থেকে মোস্তফা কামালের স্ত্রীকে ফোন করত। যে কথা হতো তা আবার মালয়েশিয়া থেকে সে বাংলাদেশের অপহরণকারীকে জানিয়ে দিত। এ ধরনের টেকনিক একেবারে নতুন হওয়ায় আমরা সত্যি খুব

সতর্ক ছিলাম। শেষে অন্য কোনো উপায় না দেখে চৌদ্দ জুলাই তারিখে এক লক্ষ টাকা মুক্তিপন প্রদানের জন্য দিন ধার্য করা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যাত্রাবাড়ী থানার বেশ কয়েকজন পুলিশকে বিভিন্ন ছদ্মবেশে আশেপাশে রাখা হয়। টাকা নিতে আসে জাকির নামের আগের সেই যুবক। তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং থানায় মামলা করা হয়। জিজ্ঞাসবাদে জাকির জানায় আমীর মিজি নামের একজনসহ আরও কয়েকজন মিলে তারা মোস্তফা কামালকে অপহরণ করেছে। মোস্তফা কামালকে ভালো কাজ দেয়ার কথা বলে গাড়ির মধ্যে পানের সাথে ঘুমের ওষুধ খাওয়ান হয়। তারপর আমীর মিজি আর তার সহযোগিরা তাকে নিয়ে গেছে, কোথায় নিয়ে গেছে সে জানে না। আগের টাকা কি করেছে বললে জানায় আমির মিজিকে দিয়েছে এবং সে সেখান থেকে ভাগ পেয়েছে। তবে আমির মিজি কিংবা মোস্তফা কামাল কোথায় আছে সে জানে না।

জাকির গ্রেফতার হওয়ার পর মালয়েশিয়া থেকে ফোন আসা বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে মোস্তাফা কামাল বেঁচে আছে কিনা সেটাও বোঝার উপায় ছিল না। এভাবেই চলতে থাকে। বিষয়টা ডিবিকেও অবহিত করা হয়। কিন্তু কিছুতেই মোস্তফা কামালের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। এতে ব্যবসায়ী আসিফ সাহেব এবং মোস্তফা কামালের পরিবার আরও ভয় পেয়ে যায়। তারা একসময় হতাশ হয়ে বলতে থাকে পুলিশকে সবকিছু না জানিয়ে অপহরণকারীদের অতিরিক্ত এক লাখ টাকা দিয়ে দিলে মোস্তফা কামালকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হতো। আমি তখন তাদের কোনোভাবেই বোঝাতে পারছিলাম না, অতিরিক্ত এক লাখ টাকা দিলে অপহরণকারীরা আবার টাকা চাইত।

মামলাটির আপডেট জানতে আমি ঐ দিন অর্থাৎ আঠার জুলাই তারিখে যাত্রাবাড়ি থানায় ফোন করি। থানা থেকে জানান হয়, কোনো অগ্রগতি নেই, মোস্তফা কামালের হদিস পাওয়া যায়নি।

মোস্তফা কামালের সন্ধান না পাওয়ার ঘটনাটা সত্যি তখন আমাকে খুব অস্থির করে তোলে। আর ঐ অস্থিরতার কারণেই হয়তো আমি সেদিন হুমায়ূন আহমেদের চরম অসুস্থতার কথাটি ভুলে গিয়েছিলাম।

১২

উনিশে জুলাই তারিখটা ছিল বৃহস্পতিবার। খুব ব্যস্ত সময় কাটছিল অফিসে। কাজের পর কাজ। হাতে সময় খুব কম। মাত্র সাত দিন পর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যাওয়ার ফ্লাইট। এই সময় আমার ছুটিতে থাকার কথা। সাধারণত মিশনে যাওয়ার আগে শেষ সাতদিন সবাই পরিবারের সাথে সময় কাটায়। আর আমি কিনা করছি অফিস! এজন্য নিজের মধ্যে তাড়াহুড়া ছিল। টার্গেট ছিল যেভাবেই হোক শনিবারের মধ্যে সব কাজ শেষ করব। এজন্য সবাইকে ডেকে সব কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু একটা সমস্যার কারণে এগোতে পারছিলাম না। তা হলো আমি চলে যাওয়ার পর কে দায়িত্বে থাকাবেন তা নিশ্চিত না হওয়া। আমার ডেপুটি এডিসি সুনন্দা তখন স্টাফ কলেজে ট্রেনিংএ। এজন্য জটিলতা আরও বেশি ছিল। কিছু অতি গোপনীয় কাজ ছিল যেগুলো যে কাউকে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। আমি কমিশনার বেনজীর আহমেদ স্যারের সাথে দেখা করে কথা বলার পর স্যার জানালেন কাকে দায়িত্ব দেয়া হবে তা তিনি দ্রুত জানাবেন।

অফিসে আসার পর পরবর্তী দিনগুলোর কাজগুলো ঠিক করে ফেললাম। শুক্রবার মিশনে যাওয়ার জন্য কেনাকাটা শেষ করা, শনিবার অফিসের সব কাজ শেষ করা, অফিসের কোনো কাজ বাকি থাকলে তা রবিবার শেষ করা এবং অফিস থেকে বিদেয় নেয়া, সোম ও মঙ্গলবার পরিবারকে সময় দেয়া। বুধবার পঁচিশ তারিখ সকালে মিশনের উদ্দেশে যাত্রা। এর ফাঁকে যে কোনো একদিন নিজের লাগেজ গুছিয়ে সেটি ডিএইচএলের মাধ্যমে দার্ফুরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা। আমি ঠিক করলাম লাগেজের কাজগুলো রবিবারের মধ্যে শেষ করব।

বৃহস্পতিবার ছিল ভয়াবহ ব্যস্ততার দিন। বিকেল পাঁচটায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ফিটনেস সেন্টার এবং ক্যান্টিনের উদ্বোধন। উদ্বোধন শেষে সবাইকে যেতে হবে রাজারবাগ টেলিকম ভবনে। সেখানে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা। সভা শুরু হতে আমি আর সেখানে থাকলাম না। রওনা দিলাম ধ্বনিচিত্রের উদ্দেশে। সেখানে একটি ডকুমেন্টারির এডিটিং করতে হবে। গাড়িতে আমার খুব মাথাব্যথা শুরু হলো। ব্যথার জন্য আমি সিটের উপর শুয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম এডিটিংএ যেতে পারব না। কিন্তু সময় নেই, যেতেই হবে। পথের মাঝ থেকে প্যারাসিটামল আর ভারগন কিনে খেলাম। কিন্তু তাতে কাজ হলো না। জোর করে এডিটিং প্যানেলে বসলাম। সাউন্ড এডিটিং এর কাজ হওয়ায় মোবাইল সাইলেন্ট মুডে রাখতে

বাধ্য হয়েছিলাম। মাথা ব্যথার কারণে আধঘণ্টা পর আর থাকতে পারলাম না। বাসায় ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। বাসায় ফেরার পর মাথা ব্যথা আরও বাড়ল। শেষে মাথায় পানি দিতে হলো। এক সময় অতিরিক্ত দুর্বলতায় কারণে ঝিমুতে লাগলাম। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম না।

রাত এগারোটার দিকে পলিন অপ্রত্যাশিত সংবাদটি দিল। সে ফিস্ ফিস্ করে বলল, হুমায়ূন আহমেদ মারা গেছেন। টিভিতে স্ক্রল দিচ্ছে।

সংবাদটা শোনার পর প্রথমে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল খুব স্বাভাবিক। আমি আমার চশমাটা চোখে দিয়ে টিভির স্ক্রিনে তাকাতে দেখলাম সেখানে লেখা উঠছে,

> দেশ বরেণ্য কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রের বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

আমি মোবাইল ফোন হাতে নিতে দেখি অনেক মেসেজ এসেছে। আর এসেছে মিস্‌কল। মেসেজগুলোর সবগুলোই হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু সংক্রান্ত। মোবাইলের রিং টন এবং ভাইব্রেশন ধ্বনিচিত্রে বসে বন্ধ করেছিলাম, এজন্য টের পায়নি। আমি এক মনে অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। আমার সামনে টেলিভিশনের পাশে তখন হুমায়ূন আহমেদের মধ্যাহ্ন বইটি ছিল। আমি খুব আবেগভরে বইটি হাতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর বিড় বিড় করে বলেছিলাম, 'হে মহান লেখক, খুব ইচ্ছে ছিল তোমাকে কাছ থেকে দেখার, দুটো কথা বলার, কিন্তু তা আর হলো না।'

বৃহস্পতিবার আমার টার্গেটের অনেক কাজ শেষ না হওয়ায় শুক্রবার আমি আমার প্ল্যান পরিবর্তন করে অফিসে আসার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর অফিসে আসা হয়নি। দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হলো মাথা ব্যথা তখনও ছিল আর দ্বিতীয় কারণ, বিভিন্ন চ্যানেলে হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো দেখছিলাম। হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে অনেক অনেক অজানা তথ্য তখন জেনেছি।

টিভিতে হুমায়ূন আহমেদের স্মরণে অনুষ্ঠানগুলো দেখে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, আমার কিছু করার আছে কিনা? বুঝতে পারছিলাম কিছু করার আছে, কিন্তু কি করার আছে সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জুম্মার নামাজের পর নালন্দা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জুয়েল ভাইয়ের ফোন পেলাম। ফোন ধরতে জুয়েল ভাই বললেন, মোশতাক ভাই, আপনি কোথায়?

বাসায়।

চ্যানেল আইতে হুমায়ূন আহমেদের স্মরণে স্মারক বই খুলেছে। আপনি কি সেখানে কিছু লিখার জন্য যাবেন?

এতক্ষণ যেন আমি এরকম কিছুই খুঁজছিলাম। তাই জোর দিয়ে বললাম, অবশ্যই যাব।

আমাকে তাহলে আজিজ সুপার মার্কেট থেকে তুলে নিয়েন।

ঠিক আছে।

আমি বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আজিজ সুপার মার্কেটে গেলাম। জুয়েল ভাইয়ের তখনও আসতে কিছুটা সময় লাগবে। সময় কাটাতে ঢুকলাম প্রথমা স্টলে। প্রথমার ম্যানেজার জয়ন্ত দা বললেন, আজ শুধু হুমায়ূন আহমেদের বই বিক্রি হচ্ছে। এত বেশি যে কল্পনা করা যাচ্ছে না।

আমি বললাম, হবেই তো। তাঁর বই বিক্রি না হলে কার বই বিক্রি হবে?

জয়ন্ত দা আবার বললেন, ধানমন্ডি থেকে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছেন আমার কাছে হুমায়ূন আহমেদের কতগুলো বই আছে। তিনি নাকি সব বই কিনে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন।

আমি কিছুক্ষণ প্রথমায় ছিলাম। যে বইগুলো বিক্রি হতে দেখলাম সবগুলো হুমায়ূন আহমেদের। এরপর প্রথমা থেকে বের হয়ে এলাম পাশের সিডির দোকানে। মিশনে শোনার জন্য বেহালার কিছু করুন সুর কেনার ইচ্ছে ছিল। দোকানগুলোতে এসে দেখি দোকানের সামনে শুধু হুমায়ূন আহমেদের নাটক আর সিনেমার সিডি রাখা হয়েছে। বিক্রিও হচ্ছে দেদারছে। এমন দিনে হুমায়ূন আহমেদের সিডি ছাড়া অন্য সিডি কেনা ঠিক হবে না ভেবে বেহালার করুন সুরের সিডি আর কিনলাম না।

জুয়েল ভাইকে নিয়ে চ্যানেল আইতে এলাম বিকেল পাঁচটার দিকে। সেখানে এসে দেখি ভবনের নিচ তলায় হুমায়ূন আহমেদের বড় একটা ছবি টাঙানো হয়েছে। সেই ছবির নিচে সারি সারি ফুলের

তোড়া আর মালা। হুমায়ূন আহমেদকে শ্রদ্ধা জানাতে গত রাত থেকে তাঁর ভক্তরা এখানে ফুল রেখে যাচ্ছে, মালা রেখে যাচ্ছে, তারপর স্মারক বহিতে লিখে যাচ্ছে শ্রদ্ধাভরা প্রিয় কিছু কথা।

দেশের মন্ত্রী থেকে শুরু করে লেখক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মিডিয়া কর্মী, সাধার মানুষ, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র শিক্ষক অনেকে এর মধ্যে স্বাক্ষর করে গেছেন। যারা বাকি আছেন এবং আসছেন তারা অপেক্ষা করছেন। আমার পালা আসতে আধঘণ্টা সময় লাগল। আমি সেখানে লিখলাম,

> হে কিংবদন্তী
> তুমি ছিলে, আছো, থাকবে; থাকবে আমাদের হৃদয়ে, হৃদয়ের অনেক অনেক গভীরে, যেখানে হিমু, মিসির আলীসহ তোমার শত সাহিত্যকর্ম আমরা সযত্নে লালন করে রাখব। তোমাকে সশ্রদ্ধ ভালোবাসা।
>
> মোশতাক আহমেদ

চ্যানেল আই থেকে আবার আজিজ সুপার মার্কেটে এলাম। আর্জিজ সুপার মার্কেটের দোতলায় 'অন্তরে' নামের একটা হোটেল আছে। সেখানকার লুচি আর ভাজি খেতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। তবে ঐ দিন লুচি আর ভাজি খেতে যাইনি। গিয়েছিলাম কিছুটা সময় হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে। চ্যানেল আই থেকে আমাদের সাথে শুভ নামের আর একজন এনজিও কর্মী এসেছিলেন। তিনি হোটেলের ভিতর বসে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ শহীদ মিনারে আনা হবে, কত মানুষ হবে বলে আপনি অনুমান করছেন?

প্রশ্নটা আমাকে করার পিছনে তার অবশ্যই যুক্তি ছিল। কারণ তখন আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্টেলিজেন্স বিষয়গুলো দেখি এবং এটা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমার পক্ষে উত্তর দেয়া সবচেয়ে কঠিন ছিল। শুধু আমি কেন, আসলে কেউই অনুমান করতে পারছিল না শহীদ মিনারে কত মানুষ হবে। তাই উত্তরটা তখন দিতে পারিনি।

এরমধ্যে জানতে পেরেছি হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ রবিবার ঢাকায় আনা হবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কখন নেয়া হবে তা তখন জানতে পারিনি। শহীদ মিনারে যে মানুষের ঢল নামবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা একটা বড় ইস্যু হবে। এজন্য প্রস্তুতিটা এখন থেকেই নেয়া দরকার। এরকম একটা চিন্তা থেকে ভাবলাম, এখনই কমিশনার স্যারের সাথে কথা বলে বিষয়টা তাকে জানাই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অবশ্য স্যারকে জানালাম না। কারণ আমার মনে হচ্ছিল স্যারকে জানানোর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয়ের দায়িত্বটা আমার উপর এসে পড়বে। তখন মিশনে যাওয়ার আগের এই কয়েকটা দিনে এক মুহূর্তও সময় পাব না।

মিশনের জন্য কিছু কেনাকাটা করে বাসায় ফিরতে রাত হয়ে গেল। সময়টা এখনও আমার মনে আছে। রাত এগারোটা তেইশ মিনিটে কমিশনার স্যার নিজেই ফোন করলেন। তারপর জানতে চাইলেন হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ কখন আসবে, কোথায় রাখা হবে এবং কোথায় সমাধি হবে। আমি যতটুকু পারলাম স্যারকে জানালাম। স্যার আরও বিস্তারিত জানতে চাইলেন এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে বললেন। স্যারের কথাতে আমি তখন বুঝতে পারলাম, চাইলেও আমি হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ সৎকার সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি সম্পাদনের প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারব না।

আগেই বলেছি হুমায়ূন আহমেদের সাথে আমার কখনও পরিচয় হয়নি, কথাও হয়নি। তবে জাফর ইকাবাল স্যারের সাথে আমার খুব ভালো পরিচয় আছে। স্যারের সাথে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়, দেখাও হয়েছে কয়েকবার। স্যার তখন আমেরিকায়, হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ দেশে আনার সামগ্রিক কর্মকান্ড সমাধানে ব্যস্ত। ঐ রকম পরিস্থিতিতে তাকে ফোন করা যুক্তিসংগত মনে হলো না আমার কাছে। হুমায়ূন আহমেদের ছোট ভাই আহসান হাবীব ভাইকে চিনি, কিন্তু তার সাথে আমার পরিচয় হয়নি। হুমায়ূন আহমেদের দেশে আসা সম্পর্কে চারদিক থেকে যে সংবাদগুলো পাচ্ছিলাম তা নিশ্চিত মনে হচ্ছিল না। যে যার মতো বলছিল। অথচ আমার সঠিক এবং যথাযথ তথ্য দরকার ছিল। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম সকালে আহসান হাবিব ভাইয়ের বাসায় যাব। সায়েন্স ফিকশন লেখক হাসান খুরশীদ রুমী ভাইকে ফোন করে আহসান হাবীব ভাইয়ের বাসার ঠিকানা

নিলাম। তারপর আমার অফিসের সার্জেন্ট সুশান্তকে ফোন করে জানালাম, সকাল দশটায় আহসান হাবীব ভাইয়ের বাসায় যাব, সে যেন তার টিমের লোক দিয়ে বাসাটা খুঁজে রাখে।

পরের দিন অর্থাৎ শনিবার থেকে রোজা। শেষ রাতে সেহরি খাওয়ার পর আর ঘুম আসছিল না। পলিনের সাথে হুমায়ূন আহমেদের কিছু স্মৃতিচারণ করতে শুরু করলাম। আমরা দুজনে বিয়ের আগে বলাকা সিনেমা হলে হুমায়ূন আহমেদের 'দুই দুয়ারী' ছবিটি দেখতে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল জীবনের এক মধুর স্মৃতি। তখন বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্স ছিল না। বলাকা সিনেমা হল ছিল প্রেমিক প্রেমিকাদের ছবি দেখার হল। বলাকা সিনেমা হলে ঐ একটি ছবিই আমরা দেখেছিলাম।

দুই দুয়ারী সিনেমার কথা মনে হতে পলিন বলল, হুমায়ূন আহমেদ ছিল বলেই ছবিটা আমরা দেখতে পেরেছিলাম এবং জীবনে কিছু সুন্দর সময় উপভোগ করেছিলাম।

আমি আফসোস করে বললাম, অথচ সেই হুমায়ূন আহমেদকেই আমার কাছ থেকে দেখা হলো না, তার সাথে কথা হলো না।

পলিন খুব অবাক হয়ে বলল, তোমার সাথে হুমায়ূন আহমেদের কখনও কথা হয় নি!

না হয় নি। একবার শুধু কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম। আর দেখিনি।

এটা কীভাবে সম্ভব?

আমি নিজে ভেবেও অবাক হই। হুমায়ূন আহমেদকে দেখা আমার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। তাঁর জন্মদিনে যখন পাবলিক লাইব্রেরিতে মেলা হয় সেখানে গেলই হতো, নতুবা তিঁনি যে অনুষ্ঠানগুলোতে মাঝে মধ্যে যান সেখানে গেলেও হতো। আর কিছু না হলে অন্তত একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে গিয়ে দেখা করলেও পারতাম। সত্যি অবাক ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ অবাক ব্যাপারই তো। তুমি লেখালেখি করো, অথচ হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা হয়নি, কথা হয় নি, ব্যাপারটা কেমন না?

এইজন্য আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কি সিদ্ধান্ত?

আমি হুমায়ূন আহমেদকে কাছ থেকে দেখব, একেবারে কাছ থেকে।

কিন্তু উঁনি তো আর নেই, মারা গেছেন।

আমি মৃত হুমায়ূন আহমেদেকেই কাছ থেকে দেখব, খুব কাছ থেকে। এতে হুমায়ূন আহমেদকে না দেখার যে অপূর্ণতা আমার মধ্যে আছে সেটা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

পলিন অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আর আমি মনে মনে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক আমি হুমায়ূন আহমেদকে আর একবারের জন্য দেখব এবং তা খুব কাছ থেকে।

১৩

একুশে জুলাই, শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মীরপুরে আহসান হাবিব ভাইয়ের বাসায় উপস্থিত হলাম। তার কাছ থেকে যতটুকু জানতে পারলাম, হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ পরের দিন অর্থাৎ বাইশ তারিখ, রবিবার সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছাবে। তারপর জাফর ইকবাল স্যার এবং পরিবারের সবার সাথে কথা বলে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন কোথায় কোথায় মরদেহ নেয়া হবে এবং কোথায় তার দাফন হবে। তবে তিনি নিশ্চিত করলেন মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেয়া হবে। ঐ মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য দরকার। তা না হলে নিরাপত্তা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কারণ পুলিশের আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি তখন সরাসরি জাফর ইকবাল স্যারকে ফোন করলাম। কিন্তু ফোন বন্ধ পেলাম। পরে ফোন করলাম সময় প্রকাশনীর ফরিদ ভাইকে। ফরিদ ভাই আহসান হাবীব ভাইয়ের মতো একই কথা বললেন।

অফিসে ফিরে আসার সময় আমি ভাবতে শুরু করলাম কীভাবে আমি আর একবার হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে পারি। ভেবে দেখলাম তাঁকে শেষবার দেখার অনেক উপায় আছে। এয়ারপোর্টে মরদেহের কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের সময় কফিন উম্মুক্ত করা হতে পারে - সেটা একটা সুযোগ। তাকে যখন তাঁর বাড়িতে আনা হবে এবং পরিবারের সদস্যরা শেষ বারের মতো তাঁর মুখ দেখবেন তখন দেখার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। শহীদ মিনারে অবশ্যই সুযোগ পাওয়া যাবে। তা না হলে জানাজার মাঠে সকলকে যখন মুখ দেখানো হবে তখন সুযোগ থাকবে। সব শেষে দাফনের সময়

দেখার সুযোগ থাকবে। এই স্থানগুলোর একটাতেও যেতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। কাজেই হুমায়ূন আহমেদের সাথে শেষ সাক্ষাৎ আমার হবেই - এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

বিকেলে সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নাসির উদ্দিন ইউসুফ ভাইয়ের (গেরিলা ছবির পরিচালক) অফিসে একটা সভা বসল। সেখানে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ ভাইও ছিলেন। ছিলেন হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওনের বাবা এবং আরও কয়েকজন। সেখানে জানা গেল প্লেনে কোনো জটিলতার কারণে হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ রবিবার দেশে আসবে না, আসবে সোমবার সকালে। মরদেহ এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ধানমন্ডি হুমায়ূন আহমেদের ফ্ল্যাট দখিনা হাওয়ায় নেয়া হবে এবং সেখান থেকে আনা হবে শহীদ মিনারে। অতঃপর পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে মাটি দেয়া হবে।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আমি অফিসে এসে কমিশনার স্যারকে জানালাম। স্যারের রুম থেকে বাইরে বের হয়ে আসতে বুঝলাম শরীর ভালো লাগছে না। আমার নিজের শরীরের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি। কিন্তু ঐ সময় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম শরীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে আগের দিনের মাথা ব্যথাটা স্বাভাবিক কোনো ব্যথা ছিল না, ঐ মাথা ব্যথাটা বড় ধরনের অসুখের লক্ষণ প্রকাশ করছিল। যেহেতু পঁাচিশ তারিখে আমার ফ্লাইট সেজন্য আগেভাগেই সতর্ক হতে হবে ভাবলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম প্রোফাইলেকটিক (রোগ প্রতিরোধের জন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ডোজ) ওষুধ খাব। কিন্তু রমজান মাস হওয়ায় আর ডাক্তারের কাছে যাওয়া হলো না, ওষুধও খাওয়া হলো না।

রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টার দিকে ডিসি হেডকোয়ার্টার্স হাবিবুর রহমান স্যার ফোন করলেন। ফোন করে প্রথমেই জানতে চেয়ে বললেন, মোশতাক, হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ দেশে আসবে কবে?

আগামী সোমবার, তেইশে জুলাই সকালে।

স্যার একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, হুমায়ূন আহমেদের জন্য আমাদের কিছু দরকার। এত বড় একজন লেখক, তার উপর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। কি বলো তুমি?

আমি সায় দিয়ে বললাম, জি স্যার, করা দরকার।

কি করা যায় বলো তো? যেখানে সারাদেশের মানুষ সবকিছু করবে সেখানে আমাদের এমন কি করার আছে?

আমি একটু সময় নিলাম। তারপর বললাম, স্যার নিরাপত্তা তো দেয়া হচ্ছেই। নিরাপত্তা দেয়ার পাশাপাশি যদি ভালো কিছু করতে হয় তাহলে বাংলাদেশ পুলিশের সালামী দল দিয়ে হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ বহন করা যায়। আমার ধারণা হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ বহনের সময় এত মানুষ হবে যে খুব ধাক্কাধাক্কি হবে। সেই ধাক্কাধাক্কিতে যেন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে সেজন্য আমাদের সালামী দলকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। যেহেতু আমাদের সালামী দল প্রশিক্ষিত তারা দায়িত্বটা খুব সুন্দরভাবে পালন করতে পারবে।

স্যার সাথে সাথে রাজি হয়ে বললেন, আমি এখনই কমিশনার স্যারের সাথে কথা বলছি। আর হুমায়ূন আহমেদের পরিবারের দিকের কার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে বে?

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট।

এ কথা বলে আমি স্যারকে নাসির উদ্দিন ইউসুফ এবং গোলাম কুদ্দুছ ভাইয়ের নম্বর দিলাম। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের হাসান আরিফ ভাইয়ের সাথেও কথা বলতে বললাম। কারণ হাসাফ আরিফ ভাইও সার্বিক প্রক্রিয়ার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন।

দশ মিনিট পর ডিসি হেডকোয়ার্টার্স স্যার আমাকে আবার ফোন করলেন। তারপর বললেল, আইজি স্যার এবং কমিশনার স্যারের অনুমতি নেয় হয়েছে, বাচ্চু ভাইয়ের সাথেও কথা হয়েছে। আমরাই হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ বহন করব, একেবারে বিমান থেকে নামানো শুরু করে কবর পর্যন্ত।

স্যারের কথাটা শোনার সাথে সাথে নিজের মধ্যে ভিন্ন এক শিহরণ অনুভব করলাম। হুমায়ূন আহমেদের মতো দেশ বরেণ্য একজন লেখকের মরদেহ বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা বহন করবে - ঐ মুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য সেটার থেকে গৌরব আর সম্মানের সংবাদ আর কি হতে পারত!

রবিবার সকালে আমরা জাতীয় শহীদ মিনারে গ্রাউন্ড মিটিং করলাম। জতীয় শহীদ মিনারে শবদেহেরে প্রতি এ ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলির অনুষ্ঠান প্রায়ই হয়ে থাকে। রমনা ডিভিশনের স্টান্ড্যার্ড অপেরেটিং সিস্টেম অনুসারে সেই অনুষ্ঠানগুলো হয়। কিন্তু হুমায়ূন আমেদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হলো। কারণ নিরাপত্তার ব্যাপারে এখানে অনেক বিষয় বিবেচনার ছিল।

সভা শেষে আমি সবকিছু কমিশনার স্যারকে অবহিত করার জন্য তার রুমে প্রবেশ করলে স্যার সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর প্রথম যে প্রশ্নটি করলেন সেটি ছিল, কত মানুষ হবে?

আমি একটু সময় নিলাম। তারপর বললাম, স্যার সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন। তবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় এক লাখের কম হবে না।

স্যার অবাক হয়ে বললেন, এক লাখ!

জি স্যার।

মরদেহ শহীদ মিনারে কতক্ষণ থাকবে?

সকাল নয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত, মোট পাঁচ ঘণ্টা।

স্যার ক্যালকুলেটরে হিসেব করে বললেন, পাচ ঘন্টা মানে প্রতি ঘণ্টায় আমাদের কফিনের সামনে দিয়ে বিশ হাজার মানুষকে পাস করিয়ে দিতে হবে। তার মানে প্রতি মিনিটে তিনশ তেত্রিশজন এবং প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ জন। এটা কীভাবে সম্ভব! তাহলে তো বিশাল লাইন হয়ে যাবে।

আমার সেরকমই মনে হচ্ছে স্যার।

অর্থাৎ আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।

জি স্যার। আমাদের আশঙ্কা কোনো কোনো ভক্ত অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে অনাকাঙ্খিত কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

অন্য কোনো আশঙ্কা?

বেদি থেকে কাফিন জাতীয় ঈদগায়ে নেয়ার সময় কিছুটা ঝুকি থাকবে। কেউ কেউ কফিনের উপর ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে পারে।

আর?

আমি আরও কিছু অবজারভেশন স্যারকে দিলাম (বিষয়গুলো অতিগোপনীয় হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা হলো না)। আমি যখন স্যারের রুম থেকে বের হয়ে আসি স্যারকে তখন ডিসি রমনা নুরুল ভাইকে ফোন করে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশনা দিতে শুনেছিলাম।

কমিশনার স্যারের রুম থেকে বের হয়ে বুঝতে পারলাম শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। সম্ভবত যে কোনো একটা অসুখের জীবানু জোটবদ্ধ হয়ে শরীর আক্রমণ করছে। তা না হলে কখনোই এতটা খারাপ লাগাত না। ওষুধ যে খাব সেই উপায়ও নেই। রোজার সময়।

সন্ধ্যায় ইফতারের পর আর থাকতে পারলাম না। ৫০০ মিলিগ্রামের একটা এজিথ্রোসিন ট্যাবলেট খেয়ে ফেললাম। এজিথ্রোসিন হলো এজিথ্রোমাইসিন, নতুন জেনারেশনের একটা এন্টিবায়োটিকস্। বেক্সিমকো ব্রান্ডের এই ওষুধের ট্রেড নেইম এজিথ্রোসিন। ওষুধটা প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। কারণ ২০০১ সালের প্রথম দিকে যখন বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ে চাকরি করতাম তখন এজিথ্রোসিন ৫০০ ওষুধটি বাজারে ছাড়ার দায়িত্ব ছিল আমার। আমি ছিলাম ওটার প্রডাক্ট অফিসার। এজিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিলিগ্রামের সবচেয়ে বড় সুবিধা এর তিন দিনে তিনটি ডোজ। অন্য এন্টিবায়োটিকস্ এর মতো দিনে কয়েকবার খাওয়ার ঝামেলা নেই। আবার ওষুধের কার্যকারিতাও সন্তোষজনক। বিশেষ করে আমার শরীরে খুব ভালো কাজ করে। আগেও কয়েকবার খেয়েছি। প্রত্যেকবার ভালো ফল পেয়েছি। ওষুধটি কখনোই আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। শরীর আক্রমণকারী বহিশত্রু জীবানুকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু এবার প্রথম ওষুধটি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। রাত এগারোটার দিকে আমার প্রচন্ড জ্বর এলো। এত জ্বর যে আমি শুয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। জ্বর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে একসময় জ্বরের ঘোরের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমানোর আগ মুহূর্তে কেউ একজন টেলিফোনে আমাকে নিশ্চিত করেছিল হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ দখিনা হাওয়ায় নেয়া হবে না, এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি জাতীয় শহীদ মিনারে আনা হবে। হুমায়ূন আহমেদের আম্মা সেখানেই তার বড় ছেলেকে শেষবারের মতো দেখবেন।

তেইশে জুন, সোমবার।

সকাল সাতটা থেকে বাসার নিচে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা। আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম ঠিকই, কিন্তু বিছানা থেকে নামতে পারছিলাম না। গতকাল শুধু জ্বর ছিল, আজ যোগ হয়েছে দুর্বলতা। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় যখন সত্যি বসতে পারলাম না, তখন নিশ্চিত হলাম আমি এয়ারপোর্টে যেতে পারব না। এয়ারপোর্টে হুমায়ূন আহমেদকে দেখার প্রাথমিক সুযোগটা আমি হারালাম।

ঘণ্টাখানেক পরে উঠে বসলাম। বুঝতে পারলাম কিছুটা ভালো লাগছে। এই সুযোগে একেবারে শহীদ মিনারে চলে এলাম। আমার পোশাক ছিল সিভিল, কারণ আমরা ইন্টেলিজেন্সের সবাই সাদা পোশাকে দায়িত্বরত থাকি। ওয়াকিটকি সেটে শোনা যাচ্ছিল হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ এয়ারপোর্ট থেকে শহীদ মিনারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

শহীদ মিনারে গিয়ে দেখি বেদির সামনে সকল টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে। কয়েকটি চ্যানেল শ্রদ্ধা নিবেদনের সম্পূর্ণ পর্ব সরাসরি সম্প্রচার শুরু করে দিয়েছে। পূর্ব দিকে মানুষের বিশাল লম্বা লাইন। শেষ মাথা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সময় যত গড়াচ্ছিল মানুষের ভীড় তত বাড়ছিল।

আমি বুঝতে পারছিলাম আমার শরীর আবার খারাপ হতে শুরু করেছে। আমি রোদ থেকে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু সেখানে স্থির থাকার উপায় ছিল না। যদিও গ্রাউন্ড নিরাপত্তার দায়িত্বের সাথে আমি সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলাম না তারপরও অনেক জুনিয়র পুলিশ সদস্য সিদ্ধান্তের জন্য আমার কাছে আসছিল। পাশাপাশি অনেক সাংবাদিক পরিচিত হওয়ায় তারা বার বার জানতে চাচ্ছিল হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ কতদূর। কারণ আমরা ওয়াকটকি সেটে হুমায়ূন আহমেদের মরদেহের অবস্থান জানতে পারছিলাম।

ঐ দিন মোস্তাফা কামালের ঘটনা আমাকে বেশ উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। কারণ সে তখনও উদ্ধার হয়নি। তার পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ। আমি বুঝতে পারছিলাম পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমি কি করতে পারি কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। আর কিছু ভেবে না পাওয়া বা না করতে পারার ব্যর্থতাটা আমাকে তীব্র কষ্ট দিচ্ছিল।

অসুস্থতার কারণে যখন আমার দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন এক সময় আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমি কেন চলে যাচ্ছি না? আমি চলে গেলে কেউ কিছু বলবে না। কারণ সবাই জানে পরশুদিন আমার ফ্লাইট। তাছাড়া এখানে এই ভেন্যুতে ইন্টেলিজেন্স এবং নিরাপত্তা সমন্বয়ের জন্য আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য অফিসারকে দায়িত্ব দেয়া আছে। তাহলে আমি এখানে কেন? উত্তর একটাই পেয়েছিলাম, আর তা হলো হুমায়ূন আহমেদকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য। এই দেখাটা না দেখলে আমি নিজে কখনও শান্তি পাব না। তাই যত কষ্টই হোক আমি একবারের জন্য হুমায়ূন আহমেদকে দেখব - এটাই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা।

দখিনা হাওয়ায় হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ না নেয়ার কারণে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে মরদেহ শহীদ মিনারে চলে এলো। সময়টা আমার সঠিকভাবে খেয়াল নেই। সম্ভবত দশটা হবে। চিলিং ভ্যান (মরদেহের গাড়ি) থেকে মরদেহ নামানোর সময় খুব ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। কে কার আগে কফিন ধরবে। আমি সত্যি খুব আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম। তবে পুলিশের সালামী দল আগে থেকে প্রশিক্ষিত এবং প্রস্তুত থাকায় কোনো সমস্যা হলো না। তারা খুব দক্ষতার সাথে কফিনসহ মরদেহ কাঁধে বহন করছিল। এয়ারপোর্টে এই দলটিই মরদেহ বহনের দায়িত্বে ছিল। তারা মরদেহের সাথে এসেছে। এজন্য তাদের সবকিছু জানা ছিল কীভাবে কি করতে হবে।

মরদেহ বেদি পর্যন্ত আনার সময় আমি নিজেও কফিনটা হাতে ধরেছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ পারিনি। অন্যদের ধাক্কায় সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে বেদিতে মরদেহ রাখার পর আমি আর সেখান থেকে সরলাম না। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল সেখানে কফিনের উপরের ঢাকনাটা একবার খোলা হবে এবং আমি হুমায়ূন আহমেদকে একবার দেখতে পাব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য উপরের ঢাকনাটা খোলা হলো না। এর মধ্যে শ্রদ্ধানিবেদন শুরু হয়ে গেল। সবার প্রথমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁদের প্রতিনিধি পুস্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন মন্ত্রী এবং সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি আসতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরাও এলো। সামনে ছিলেন কমিশনার স্যার। স্যারের

সাথে সাথে আমরাও দেশবরণ্যে কথাসহিত্যিক এবং নাট্যকর হুমায়ূন আহমেদের কফিনে পুস্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে আমি কফিন থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার তখন দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমি চলে যেতে পারছিলাম না। কারণ কখন হুমায়ূন আহমেদের আম্মা আসবেন এবং কফিন খোলার পর আমি হুমায়ূন আহমেদকে দেখব - সেই ইচ্ছেটা আমাকে যেতে দিচ্ছিল না।

এনেক্স ভবন আর ঢাকা মেডেকেল কলেজের সামনে তখন মানুষ আর মানুষ। কিন্তু লাইনের গতি খুব কম। কারণ যিনি কফিনের সামনে যাচ্ছেন তিনি আর সরছেন না। যেখানে আমাদের হিসেবে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচজন মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা, সেখানে প্রতি দশ সেকেন্ডেও একজন হচ্ছে না। কাউকে কাউকে দেখলাম কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, বলার পরও সরছে না। কফিনের উপর তখন ফুলের স্তূপ জমে গেছে। এত ফুল যে ওপাশে হুমায়ূন আহমেদের পরিবারের সদস্যদের ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না। তখন উপায় না দেখে, দায়িত্বরত ভলেন্টিয়াররা ফুলগুলো সরিয়ে বেদির পিছনে রাখতে শুরু করল।

আমি ষোল সতের বছরের একটি মেয়েকে অনেকগুলো কদম ফুল হাতে এগিয়ে আসতে দেখলাম। যারা শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন তাদের কারো হাতে কদম ফুল দেখিনি। এই প্রথম কাউকে কদম ফুল হাতে দেখলাম। কদম ফুলকে কখনও আমার ধনীদের ফুল মনে হয় না। গরীবদের ফুল বলে মনে হয়। কারণ সাধারণত যত্ন করে কেউ কদম ফুল বাড়িতে লাগায় না। কদম ফুল গ্রামের পথে ঘাটে যেখানে সেখানে হয় এবং নিজের মতো করে বড় হয়। গরীব ছেলে মেয়েরা এই ফুলগুলো নিয়ে নানারকম খেলা খেলে। এজন্য আমার মনে হয় কদম ফুল গরীবের ফুল। অথচ আমার সামনে যে মেয়েটি কদমফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ধনীর মেয়েই মনে হচ্ছে। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটির সাথে হঠাৎ আমার চোখাচোখি হলো। আমি উৎসুক হয়ে বললাম, আপনি কদম ফুল এনেছেন কেন?

মেয়েটি উজ্জ্বল মুখে বলল, হুমায়ূন আহমেদ কদম ফুল খুব পছন্দ করেন, তাই।

কীভাবে জেনেছেন?

তাঁর বই পড়ে।

পেলেন কোথায় কদম ফুল?

আমাদের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল থেকে আনিয়েছি।

এরপর মেয়েটি সামনের দিকে চলে গেল। আমি খুব বিস্মিত হলাম মানুষের ভালোবাসার গভীরতা দেখে। একজন লেখক একজন ভক্তের কত প্রিয় হলে সেই ভক্ত শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সুদূর গ্রামের বাড়ি থেকে কদম ফুল এনে এই তপ্ত রোদে শহীদ মিনারে আসতে পারে! আমি জানি না বাংলাদেশের আনাচে কানাচে হুমায়ূন আহমেদের এরকম কত ভক্ত আছেন যারা বাদল দিনের কদম ফুল হাতে হুমায়ূন আহমেদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। হয়তো দূরত্বের কারণে তারা ঢাকার এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসতে পারেননি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তাদের কদম ফুলে সুভাসিত বুক ভরা শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা ঠিকই পৌঁছে যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে রহস্যময় আর বিস্ময়কর লেখক হুমায়ূন আহমেদের কাছে।

এক পর্যায়ে আমি বুঝতে পারলাম আমার যে অবস্থা তাতে আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। তাই বেদির পিছনে পুলিশের যে কন্ট্রোল রুম ছিল সেখানে গিয়ে বসলাম। আমি অনুধাবন করলাম, আমার চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে, মুখ একেবারে শুকিয়ে আসছে। অ্যান্টিবায়োটিকস্ এর সাইড ইফেক্ট কিনা বুঝতে পারলাম না। রোযার কারণে এমন হতে পারে ভাবলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন চোখের সামনে সবকিছু মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল বুঝলাম সমস্যা অন্য কোথাও। এখানে আর থাকার মতো অবস্থা নেই। বডিগার্ডকে বললাম, গাড়ি নিয়ে সোজা পুলিশ হাসপাতালে যাবে।

হুমায়ূন আহমেদকে দেখার চিন্তা তখনও মাথা থেকে যায়নি। হুমায়ূন আহমেদকে শহীদ মিনার থেকে জানাজার জন্য জাতীয় ঈদগাঁয়ে নেয়া হবে। তখন তাকে আমি দেখবই - এরকমই ছিল শেষ পিরিকল্পনাটা।

হাসপাতলে গিয়ে দেখা গেল আমার জ্বর একশ দুই ডিগ্রী। ডাক্তার সরাসরি বললেন, রোযা ভেঙ্গে বিশ্রামে চলে যান।

আমি যখন বললাম পরশুদিন আমার ফ্লাইট তখন তিনি বড় বড় চোখে বললেন, এরকম জ্বর থাকলে যাবেন কীভাবে?

আমি অ্যান্টিবায়োটিকস্ শুরু করে দিয়েছি।

তাহলে বিশ্রাম নিন। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। মনে হচ্ছে যে কোনো কারণে আপনি মানসিক চাপের মধ্যে আছেন।

মোস্তফা কামালের বিষয়টা নিয়ে আমি সত্যি মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম। কি করব ভেবে না পেয়ে ডিসি ডিবি সাউথ মনির স্যারকে ফোন করলাম। স্যার কেসটার উপর কাজ করছিলেন। আমি কেসটার বিষয়ে স্যারকে অনুরোধ করলে স্যার জানালেন, অপহরণকারীরা খুব চালাক।

আমি জোর দিয়ে বললাম, স্যার যেভাবেই হোক মোস্তফা কামালকে জীবিত উদ্ধার করতে হবে।

আমার বিশ্বাস আমরা পারব।

কীভাবে বলছেন স্যার?

আমরা মালয়েশিয়ায় যোগাযোগ করেছি। মালয়েশিয়ায় যে নম্বরটা থেকে ফোন করা হচ্ছে ওটার ব্যবহারকারীকে সনাক্ত করা যাবে। ঐ চ্যানেলে কাজ করছি। আশা করছি অল্প সময়ে ভালো অগ্রগতি হবে।

আমি স্যারকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

মনির স্যারের সাথে কথা বলার পর আমার নিজেকে খুব হালকা মনে হতে লাগল। কেন যেন মনে হচ্ছিল কেসটা দ্রুত ডিটেকড্ হয়ে যাবে। সব আসামী ধরতে হবে, মোস্তফা কামালকে সুস্থভাবে পুলিশ তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে। এরকম মনে হতে নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে হলো আমার।

আরও কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝতে পেরে আমি হাসপাতালেই অবস্থান করলাম। হাসপাতালের টিভিতে সবগুলো চ্যানেলে তখন শহীদ মিনারে হুমায়ূন আহমেদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। সেখানে দেখলাম তাঁর আম্মাও চলে এসেছেন। আমি তখন বুঝতে পারলাম হুমায়ূন আহমেদকে দেখার আর মাত্র দুটি সুযোগ আছে আমার। প্রথমটি জাতীয় ঈদগাঁয়ে এবং দ্বিতীয়টি নুহাশ পল্লীতে তাকে দাফন করার সময়। কিন্তু সময়ের যে স্বল্পতা তাতে নুহাশ পল্লীতে আমার পক্ষে আমার যাওয়া সম্ভব না। কাজেই সুযোগ দুটি এবং তা জাতীয় ঈদগায়ে।

আমি আর দেরি করলাম না। গাড়িতে উঠলাম, গন্তব্য জাতীয় ঈদগাঁও। কিন্তু খুব একটা বেশিদূর এগোতে পারলাম না। তীব্র মাথার যন্ত্রণা আমাকে অস্থির করে তুলল। সাথে জ্বরও বাড়তে লাগাল। সাথে নতুন আর এক উপসর্গ দেখা দিল। সেটা হলো বমির ভাব হওয়া। আমার মনে হচ্ছিল আমি যে কোনো সময় বমি করে দিতে পারি।

ওসি শাহবাগকে ফোন করে জানলাম জানাজা শুরু হবে আরও ঘণ্টা দেড়েক পরে। কিন্তু আমি জানতাম দেড় ঘণ্টা পর জানাজা শুরু হবে না। আরও সময় লাগবে। কারণ ওয়াকিটকিতে তখন পুলিশ অফিসারদের বলতে শুনতে পাচ্ছিলাম, 'দোয়েল চত্বর থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ, মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো যাচ্ছে না, সামনে তাড়াতাড়ি করুন, দ্রুত সবাইকে পাস্ করুন...দ্রুত.. ।'

আমি বুঝলাম হাতে কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। সরাসরি বাসায় চলে এলাম। বাসায় মোবাইল ফোন, ওয়াকিটকি বন্ধ করে নিরিবিলি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। তখন আমি বুঝতে পারছিলাম, সত্যি আমার কিছুক্ষণ বিশ্রাম প্রয়োজন, তা না হলে কোনো কাজই করতে পারব না।

অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি পৌনে তিনটা বাজে। বুঝতে পারলাম অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। শরীর খুব দুর্বল লাগছিল। আবার ওসি শাহবাগকে ফোন করলাম। জানতে পারলাম জানাজা সম্পন্ন হয়েছে এবং মরদেহ নিয়ে সবাই রওনা করেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মরদেহ এখন নুহাশ পল্লীতে যাবে, সেখানেই হুমায়ূন আহমেদেকে দাফন করা হবে। হুমায়ূন আহমেদকে দেখার আমার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আমার এই অবস্থায় আমার পক্ষে নুহাশ পল্লীতে যাওয়া সম্ভব না।

এমন সময় ইন্টেলিজেন্স অপস্ থেকে আমাকে ফোন করে জানানো হলো, স্যার, হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ বারডেমে পৌঁছে গেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বারডেমে কেন?

স্যার এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি হুমায়ূন আহমেদেকে কোথায় দাফন করা হবে। মরদেহ আজ বারডেমের হিমঘরে রাখা হবে। আগামীকাল দাফন করা হবে।

আমি সকালে এ ধরনের একটা আভাস পেয়েছিলাম এবং সেরকমই হচ্ছে। আমি বারডেমে হুমায়ূন আহমেদকে দেখার আর একবার সুযোগ পাব ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

আমি লক্ষ করলাম বিকেল থেকে আমার জ্বর ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। একইসাথে মাথার ব্যথাও কমে আসছে। বমি বমি ভাবটা নেই। বুঝলাম আমার বিশ্বস্ত এজিথ্রোসিন ৫০০ কাজ করতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যায় ইফতারের পর যখন এক কাপ চা খেলাম তখন একেবারে সুস্থ হয়ে গেলাম। এই সুযোগে জাতিসংঘ মিশনের জন্য লাগেজগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেললাম। সেই সাথে ডকুমেন্টারির যে কাজগুলো বাকি ছিল সেগুলো শেষ করার জন্য ধ্বনিচিত্রে গেলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। বাসায় সবাই আমার উপর তখন কিছুটা হলেও মনক্ষুণ্ন। কারণ আমি তাদের মোটেও সময় দিচ্ছি না।

রাত সাড়ে দশটা থেকে শুরু হলো ফোন। প্রথম ফোন করল এসিসেট্যান্ট কমিশনার অপারেশনস্। হুমায়ূন আহমেদকে কোথায় দাফন করা হবে তা জানা তার খুব দরকার। কারণ যদি মীরপুর বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে দাফন হয় তাহলে ডেপুটি কমিশনার মীরপুরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আর যদি নুহাশ পল্লীতে হয় তাহলে গাজীপুর জানিয়ে দিতে হবে। এরপর শুরু হলো সংবাদিকদের ফোন। অনেক সাংবাদিক জানেন, কিছু কিছু খবর আমি সবার আগে জানতে পারি। তাই একটার পর একটা ফোন আসতে লাগল। আমি একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম। কয়েকজন প্রকাশক ফোন করেও সর্বশেষ অবস্থাটা জানতে চাইলেন। আবার বেশ কয়েকজন লেখকও ফোন করলেন। শেষে ফোন শুরু হলো আত্নীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবের। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পুলিশ কন্ট্রোল রুম আর ইন্টেলিজেন্স অপস্ এর ফোন তো আছেই।

রাত দেড়টা কি দুইটার দিকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল, হুমায়ূন আহমেদের দাফন হবে নুহাশ পল্লীতে। সেখানেই চির নিদ্রায় শায়িত হবেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ।

১৫

চব্বিশে জুলাই, মঙ্গলবার।

ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। সারাদিনের কাজগুলো কি মনে মনে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল হুমায়ূন আহমেদকে কাছ থেকে এক নজর দেখা। তারপর সকল মালামাল ডিএইচএলে দার্ফুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এই কাজটা আমার আরও দুই দিন আগে করার কথা ছিল। কিন্তু ব্যস্ততার জন্য করতে পারিনি। তারপর কমিশনার স্যারের কাছ থেকে বিদেয় নেয়া। মোস্তাফা কামাল উদ্ধার হয়নি কথাটা মনে পড়তে মন খারাপ হয়ে গেল। এই মানুষটাকে আমি কখনও দেখিনি, তাকে চিনিও না, কিন্তু কেন যেন তার জন্য বার বার মন খারাপ হতে থাকে।

আমি ঠিক করলাম সকাল এগারোটার মধ্যে সকল কাজগুলো শেষ করব। সকাল সাড়ে আটটায় বারডেমে চলে এলাম। বারডেমে এসে দেখি অনেক মানুষ জড়ো হয়ে আছে। বারডেম হাসপাতালের অনেক স্টাফ, নার্স আর রুগীর এটেনডেনডেন্টও নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বারান্দা দিয়ে যে হিম ঘর (যেখানে মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়) পর্যন্ত যাব সেই উপায় নেই। একবার চেষ্টা করতে ধাক্কার জন্য পিছনে ফিরে আসলাম। শেষে পুলিশের সাহায্য নিয়ে হিম ঘরে যেতে হলো। হিম ঘরের সামনের অংশটা বড় একটা আড়াআড়ি টেবল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। তা না হলে সবাই ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ভিতরে ঢুকে দেখি সেখানে এসি (এসিস্টেন্ট কমিশনার) কল্যাণ ফয়জুর রহমান দাঁড়িয়ে আছেন। তার দায়িত্ব পড়েছে মরদেহ বারডেম থেকে নুহাশ পল্লী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার। তার সাথে আছে পুলিশের সালামী দল যারা মরদেহ বহন করবে। এসি কল্যাণের চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম তিনি খুব চিন্তায় আছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি তিনি আগে মোকাবেলা করেননি, ডিএমপিতে একেবারে নতুন অফিসার তিনি। আমাকে দেখে নিজে থেকেই বললেন, স্যার এত মানুষের মধ্যে দিয়ে কফিন নেব কীভাবে?

আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা সহজ হবে না। তখনও হিমঘরের চেম্বার থেকে মরদেহ বের করা হয়নি। কারণ মরদেহ বহনকারী চিলিং ভ্যান এসে পৌঁছায়নি। ভিতরে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন বারডেমের পরিচালক এবং হুমায়ূন আহমেদের শ্বশুর (শাওনের বাবা)। আমি প্রথমে পরিচালকের সাথে কথা বললাম। রমনা ডিভিশিনের এডিসি থাকায় আমি আগেও এখানে কয়েকবার এসেছি। আমার জানা ছিল এখান থেকে মরদেহ দ্রুত এম্বুলেন্সে উঠানোর জন্য এবং স্টাফদের চলাচলের জন্য একটা শর্টকাট পথ আছে। আমি ঐ শর্টকাট পথের দরজাটা খুলে দিতে বললেন তিনি দরজাটা খুলে দিলেন। তবে কেউ বুঝতে পারল না যে ঐ দরজা দিয়ে বের হওয়া যায়। আমি এসি কল্যাণকে পথটা দেখিয়ে দিলাম। তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ তিনি খুব আতঙ্কে ছিলেন এই ভেবে যে সামনের শত শত মানুষের মধ্যে দিয়ে কফিন নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের সাথে আবার এখানকার মানুষের ধাক্কাধাক্কি না হয়।

এর মধ্যে চিলিং ভ্যান চলে এলো। হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ হিমঘর থেকে নামিয়ে কফিনের মধ্যে রাখা হলো। সাথে সাথে মানুষের সে কি ধাক্কাধাক্কি! টিভি ক্যামেরাগুলো কার আগে কে শর্ট নেবে সেই প্রচেষ্টায় আছে। টেবিলের ওপাশে সময় প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী ফরিদ ভাইয়ের ভীড়ের চাপে তখন একেবারে কাহিল হওয়ার অবস্থা। আমি টেবিলের পাশে দায়িত্বরত কনস্টেবলকে তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে বলালাম। তাকে ভিতরে আনতে গিয়ে আরও দুজন ভিতরে ঢুকে গেল।

হুমায়ূন আহমেদ আমার তখন একেবারে কাছে, আমার চোখর সামনে। আমি তাঁর এত কাছে যে আর কেউ তাঁর এত কাছে নেই। মুখসহ তাঁর সমস্ত শরীর সাদা কাপড়ে ঢাকা। এদিকে এসি কল্যাণসহ সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কফিন চিলিং ভ্যানে তোলার জন্য। কফিনের উপরের ঢাকনাটা তখনই আটকে দেবে দেবে অবস্থা। কফিনের অর্ধেক এর মধ্যে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। আমি কীভাবে হুমায়ূন আহমেদকে দেখব? কেউ তো দেখতে চাচ্ছে না। হিম চেম্বার থেকে বের করার পর সাধারণত মরদেহের চেহারা একবার দেখে নেয়া হয়। এর কারণ, ভুল করে যেন অন্য কারো মরদেহ বের হয়ে এসছে কিনা তা নিশ্চি হওয়ার জন্য। অনেক আগে একবার এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি সেই কথা মনে করে হুমায়ূন আহমেদের শ্বশুরকে বললাম, একবার কি মুখটা দেখে নেবেন? আমার মনে হয় দেখে নেয়া দরকার আছে।

হঠাৎ ফোন আসায় তিনি ফোনে কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বলতে বলতেই বললেন, এখন দেখতে গেলে অনেক সময় লাগবে। উপরের সাদা কাঁপড়ের গিট খুলে আবার বাঁধতে হবে। আমরা বরং তাড়াতাড়ি চলে যাই। চিলিং ভ্যান আসতে দেরি হওয়ায় এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা চূড়ান্তভাবে উপরের ঢাকনা লাগানোর অনুমতি চাচ্ছে। আমি অনুমতি দিলেই তারা কাজ শুরু করবে। তাকিয়ে আছেন এসি কল্যান ফয়েজও। আমার বুক চিরে তখন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। হুমায়ূন আহমেদ আমার এত কাছে অথচ আমি তাকে দেখতে পারছি না। এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে!

আমি ইশারা করতে দায়িত্বরত পুলিশের সদস্যরা দ্রুত কফিনের ঢাকনাটা লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর সেই সাথে হুমায়ূন আহমেদকে শেষ বার দেখার ইচ্ছেটাও আমার শূন্যে মিলিয়ে গেল।

এরমধ্যে বাইরে, চিলিং ভ্যানকে পিছনের দরজার সামনে দাঁড়াতে দেখে অনেকে বুঝে গেছে মরদেহ পিছনের পথ দিয়ে নেয়া হবে। খবরটা সামনের দিকেও চলে এলো। এতে অনেকে পিছনের দিকে ছুটে গেলেও সামনে যারা ছিল তারা শরীরের সমস্ত শক্তিতে টেবিল ধাক্কাতে লাগল। অবস্থা এমন যে টেবিল দিয়ে আর তাদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

এমন সময় ফরিদ ভাই বললেন, জাফর স্যার আপনার স্যাথে কথা বলবেন। এই যে ফোনে আছেন।

আমি ফরিদ ভাইয়ের দিকে ফিরে ফোন ধরতে জাফর ইকবাল স্যার অনুরোধ করে বললেন, আর কিছুক্ষণ মরদেহ রাখা যায় কিনা? তিনি প্রায় চলে এসেছেন।

আমি পিছন ফিরে দেখি পুলিশের সবাই কফিন নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। সামনে যারা টেবিলের ওপাশে ছিল তারাও টেবিল ধাক্কিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। আমি স্যারকে বিনীতভাবে বললাম, স্যার, গাড়ি রওনা দিয়ে দিচ্ছে, আপনি পথেই পাবেন।

আমি যখন বাইরে বের হয়ে এলাম হুমায়ূন আহমেদকে বহনকারী গাড়ি তখন শাহবাগ মোড় ঘুরে ফার্মগেটের দিকে ছুটে যেতে শুরু করেছে। রাস্তা তখন একেবারে ফাঁকা। দেশ বরেণ্য লেখক

হুমায়ূন আহমেদের শেষযাত্রাকে বাঁধাহীন করতে ট্রাফিক পুলিশ তখন রূপসী বাংলাসহ সামনের বেশ কয়েকটি ক্রসিংএ গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের পাড়ির পিছনে তখনও কয়েকজন ক্যামেরামান ছুটে চলছে। আমি তখন বুঝতে পেরেছিলম, হুমায়ূন আহমেদের কোটি ভক্ত যেভাবে হুমায়ূন আহমেদকে ভালোবাসে, ঠিক তেমনি ঐ ক্যামেরাম্যানরাও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসে তাদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক এবং দেশ ও জাতির গৌরব হুমায়ূন আহমেদকে।

১৬

এত কাছে থেকেও হুমায়ূন আহমেদকে আমি দেখতে পারলাম না! বারডেম থেকে অফিসে আসার পথে এই ভাবনাটা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল। আমি অফিসে ফিরে আসার সময় আমার ড্রাইভার কন্সটবল ইব্রাহিম বোধহয় আমার কষ্টটা বুঝতে পারছিল। সে বলল, স্যার শরীর কি খারাপ লাগছে?

বললাম, না।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, ইব্রাহিম, গাড়ির তেলের কি অবস্থা? গাজীপুর যাওয়া যাবে?

হ্যাঁ স্যার যাবে।

প্রস্তুত থাকবেন, আমি যে কোনো মুহূর্তে গাজীপুর যেতে পারি।

ঐ মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল আমি গাজীপুর নুহাশ পল্লীতে যাই, গিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে দেখে আসি। কিন্তু মনে সায় পাচ্ছিলাম না। আমার মিশনে যাওয়ার ফ্লাইটের চব্বিশ ঘন্টাও সময় নেই। এখন গাজীপুর গেলে কমপক্ষে চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। তাছাড়া গাড়ীও নেই। গাজীপুর যেতে হলে কমিশনার স্যারের অনুমতি লাগবে।

আমি ঠিক করলাম অনুমতি নেব না, যা হবার হবে। আমি তখন একটা মাইক্রোতে ছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, মাইক্রো নিয়ে গাজীপুর চলে যাব। কমিশনার স্যারের কাছ থেকে আগে শুধু বিদেয় নিয়ে আসতে হবে, এই যা কাজ।

আমি কমিশনার স্যারের রুমে ঢুকে স্যারকে আমার ফ্লাইটের কথা বললাম।

স্যার একটু ভেবে বললেন, আমি তো এখন পর্যন্ত কাউকে দায়িত্ব দিতে পারলাম না। তোমার জন্য সমস্যাই হয়ে গেল। তাছাড়া তোমার কিছু অফিসারও নতুন, তাই না?

আমি সায় দিলে বললাম, জি স্যার, নতুন।

তুমি বরং এক কাজ করো। যাওয়ার আগে ওদের একটু ডাক দাও। আমি তোমার উপস্থিতিতে ওদের সাথে একটু কথা বলি, ওদের ব্রিফ করি।

কখন ডাকব স্যার?

আধ-ঘণ্টা পর।

ঠিক আছে।

স্যারের রুম থেকে বের হয়ে ঘড়ি দেখলাম। মনে মনে খুশি হলাম এই ভেবে যে স্যার খুব বেশি হলে আধ-ঘণ্টা ব্রিফ করবেন। তারপরই আমি ফ্রি এবং গাজিপুর যেতে পারব।

এর মধ্যে ডিএইচএল থেকে ফোন পেলাম। ডিএইচএল এর ম্যানেজার জানাল, আমার মালামাল তাদের কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমি স্বাক্ষর না করলে তারা আমার মালামাল দার্ফুরে পাঠাতে পারবে না।

আমার হাতে তখন একেবারে সময় নেই। বললাম, আমি স্বাক্ষর করতে পারব না। আমার পক্ষে যে গেছে সেই স্বাক্ষর করবে।

ম্যানেজার বলল, এটা আমাদের নিয়মের বাইরে।

নিয়মের বাইরে কি ভিতরে জানি না। যেভাবে হোক আপনার মালামালগুলো পাঠাতে হবে, তা না হলে আমি সমস্যায় পড়ব।

ম্যানেজার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, এতে আপনার অন্য সমস্যা হবে। মালামাল হারানো গেলে ফেরত পাবেন না। আপনার স্বাক্ষর মিলবে না।

হারালে হারাবে। আমি সেটা নিয়ে চিন্তা করছি না।

ঠিক আছে, তাহলে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি খুশিই হলাম। কমপক্ষে আধ-ঘণ্টা সময় বেঁচে গেল। নুহাশ পল্লীতে যাওয়ার জন্য এই সময়টা আমার খুব কাজে লাগবে।

এদিকে জরুরী সভার জন্য কমিশনার স্যারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডাক পড়ল। স্যার সেখানে চলে গেলেন। আমি একেবারে দমে গেলাম। মনে হচ্ছিল স্যারকে ফোন করে বলি, স্যার আমি নুহাশ পল্লীতে যাব, আপনি ব্রিফিংটা পরে করুন। কিন্তু সেটা বলা সম্ভব না। কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম ব্রিফিংটা সবার জন্য খুব জরুরী।

এর মধ্যে একটা ভালো খবর পেলাম। পুলিশ মোস্তফা কামালকে উদ্ধার করেছে। আসামীদেরও গ্রেফতার করেছে। সংবাদটা আমাকে দারুন আনন্দিত করল। মনে হলো বুকের ভিতর থেকে বুঝি অনেক বড় একটা পাথর নেমে গেল।

কমিশনার স্যার ফিরে এলেন একটার সময়। খুব বেশি সময় তিনি নিলেন না। মাত্র বিশ মিনিটে চমৎকারভাবে সবাইকে ব্রিফ করলেন।

আমি যখন স্যারের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে আমার অফিসে ফিরলাম তখন টেলিভিশনে হুমায়ূন আহমেদের দাফন প্রক্রিয়া দেখাচ্ছিল। যতদূর মনে পড়ে তখন গাজীপুরে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, দেখছিলাম আমার প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদকে যিনি আর কখনো, কোনোদিনও আমার এবং আমাদের জন্য লিখবেন না, কিন্তু তিনি থাকবেন, থাকবেন আমাদের হৃদয়ে, হৃদয়ের অনেক অনেক গভীরে যেখানে আমরা ভালোবাসা আর ভালোলাগার আবেশে সযত্নে লালন করব তাঁকে আর তার অসাধারণ সব সৃষ্টিকে।

১৭

মিশন থেকে ছুটিতে দেশে এসে ২০১২ সালের অক্টোবর মাসের তিন তারিখে আমি নুহাশ পল্লীতে হুমায়ূন আহমেদের সমাধিতে যাই। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। সাথে ছিল স্ত্রী পলিন, দুই ছেলে শাফিন আর আরিক। সামাধির উপর সাথে করে নিয়ে যাওয়া ফুলের তোড়াটা রাখতে শাফিন বলল, আব্বু, এই কবরটা কার?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, কিংবদন্তী হুমায়ূন আহমেদের।

উনি কি করতেন?

লিখতেন।

কি লিখতেন?

গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, সিনেমা আরও অনেক অনেক কিছু লিখতেন।

উনি কি অনেক বড় মানুষ ছিলেন আব্বু?

হ্যাঁ অনেক অনেক বড় মানুষ ছিলেন।

শাফিন একটু থেমে বলল, আব্বু, তুমি কি তাঁকে দেখেছ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ দেখেছি, এক ঝলক ঐ কিংবদন্তীকে দেখেছি।

শাফিন ছোট্ট মানুষ। সে কি বুঝল বোঝা গেল না। শুধু ভাঙ্গা ভাঙ্গাভাবে বলল, এক ঝলক কিংবদন্তী হুমায়ূন আহমেদ।

রচনাকালঃ বাহরাইন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ১১.১১.২০১২ - ১৭.১১.২০১২ মুহাজেরিয়া, দার্ফুর, সুদান